বি. টি. রোডের ধারে

সমরেশ বসু

অণিমা প্রকাশনী
১৪১, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৩ জুন

প্রচ্ছদ : চারু খান

প্রকাশক : শ্রীদ্বিজদাস কর, অণিমা প্রকাশনী ; ১৪১, কেশবচন্দ্র সেনষ্ট্রিট, কলকাতা ৯

মুদ্রণ : শ্রীসুকুমার দে, বাসন্তী প্রেস, ১৯ এ, ঘোষ লেন, কলকাতা ৬

ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ বইটির প্রথম সংস্করণের কপিটি আমাদের ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

—**প্রকাশক**

দিন শেষ না হতেই রাত্রি নেমে এল। সারাদিনের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ-ছড়ানো আকাশটার এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো পর্যন্ত কে যেন দিগন্তহীন আলকাত্‌রার ব্রাশ নিয়ে গেল বুলিয়ে। পূব থেকে পশ্চিমে ছুটেছে আলকাত্‌রার ব্রাশটা, এখান থেকে অনেক দূরে, তীব্র গতিতে, দিক হতে দিগন্তে, দেশান্তরে। যেন মেঘের ডালাটা গলে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ছড়িয়ে পড়ছে আর গলে গলে পড়ছে পৃথিবীতে। কালোয় কালো হয়ে যাচ্ছে আকাশমাটি। কোথাও কোন সীমারেখা ঠাহর করা যাচ্ছে না।

বাতাস বইছে। পূবে বাতাস। খ্যাপা হাঙ্গরের মত বাতাসটা কখনো যেন ল্যাজ নাড়ছে ধীরে ধীরে। কখনো তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে ঝাপটা মারছে অন্ধকার শূন্যে। গোঁ গোঁ সোঁ সোঁ শব্দ উঠছে বাতাসে। থেকে থেকে ঝলকাচ্ছে বিদ্যুৎ। যেন আদিগন্ত অন্ধকারকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলতে চাইছে কতগুলি তীক্ষ্ণ তলোয়ার। বুম্‌ বুম্‌ শব্দে [illegible] মাটি। আর তার সঙ্গে ইল্‌শেগুঁড়ির ছাট। রাশি রাশি [illegible] একের মত বাতাসের ঝাপটায় গায়ে এসে বিঁধছে। হাওয়ার [illegible] সে বিঁধছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে। দুর্যোগের অন্ধকার, [illegible]এর। ঘড়ির কাঁটায় এখনো নামে নি অন্ধকার, যে ঘড়ি [illegible] রা দেখে না। শুধু চলে আর বাজে। তাই মিউনিসি-[illegible]লর বিজলী বাতিগুলি জ্বলে নি এখনো।

[illegible] জ্বলে উঠছে দোকানে দোকানে। লম্ফ আর প্রদীপ জ্বলে ঘরে ঘরে। সেখানে ঘড়ি নেই। মানুষের প্রয়োজনে বাতি

[illegible] পৌঁছে সুদীর্ঘ বি টি রোডের উপর। বি টি রোড: [illegible] তা[illegible]কে বারাকপুর, বারাকপুরের চিড়িয়ামোড় থেকে হঠাৎ [illegible] য়িক[illegible] রে বি টি রোড জি পি রোড নাম নিয়ে আবার সাঁ সাঁ [illegible]টা।

করে ছুটে গেছে উত্তর দিকে। সেই কাঁচরাপাড়া পর্যন্ত।

এই সুদীর্ঘ রাস্তা জুড়ে ভিড় লেগেছে। কলকারখানার ছুটির ভিড়। সারা বাংলার বৃহত্তম শিল্পকেন্দ্র এই রাস্তা। গঙ্গার তীরে তীরে, রেললাইনের ধারে ধারে অসংখ্য কারখানা ইমারৎ। তারই ছত্রছায়ায় ছড়ানো আবর্জনা স্তূপের মত বস্তি। এবড়ো খেবড়ো, বাঁকাচোরা, দোমড়ানো সুদীর্ঘ শিল্পশহর। মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য চিমনি। অন্ধকারে অদৃশ্যচারী ভূতের রক্তচক্ষুর মত লাল বাতি জ্বলছে চিমনিগুলোর মাথায়। ধোঁয়া ছাড়ছে অনর্গল। সেই ধোঁয়া বৃষ্টির ছাটে ধুয়ে যেন তরল কাশির মত ঝরছে কারখানায়, রাস্তায়, বস্তিতে। যেন একটা মাইলের পর মাইল কালো পটের উপরে, কালো ভারী পোস্টারকলারের থ্যাবড়া ব্রাশে ছবি আঁকা হয়েছে।

এই সুদীর্ঘ পথ জুড়ে চলেছে ঘর মুখো মানুষের দল। অন্ধগুহার গায় অবয়বহীন ছায়ার মত চলেছে সবাই। ভিড় জমে উঠেছে চা-খানাগুলিতে, পান বিড়ির দোকানে, শুঁড়িখানায়। কিন্তু আকাশ দ্রুত তাড়া দিয়েছে সবাইকে ঘরে ফেরার।

সবাই বৃষ্টির ছাটে মাথা নুইয়ে গালাগাল দিচ্ছে আকাশটাকে। আকাশের মা, বোন, বাপ, সবাইকে। রাস্তার দুপাশে... সাজানো বিপণি সামলাচ্ছে দোকানওয়ালারা, পাততাড়ি... তাড়াতাড়ি। ব্যবসা মাটি ফেরিওয়ালাদের। ফেরা... অভ্যাসবশতঃ হেঁকে চলেছে তারা হাঁক পাঁক করে ছুটে... পড়ছে দাদ-দিনাই-খুজালির দাওয়াইওয়ালারা। বক্তৃতা বন্ধ... দিয়েছে ইন্দ্রিয়সালসা ও ঈশ্বরদত্তবটিকা বহনকারী, পথে পথে... হাকিম, বৈদ্য, ডাক্তার আর গুনিনের দল। আর চিবিয়ে চিবিয়ে... দিচ্ছে প্রকৃতিকে। আর প্রকৃতি যেন, পাগলের পেছনে লাগা ছে... দলের মত হাওয়ার ছপটি মারছে, ঝড়িয়ে দিচ্ছে গুঁড়ি গুঁড়ি ছা... কিন্তু ভিড়টা একেবারে কমল না। এই বি... কখনো। যেমন গভীর অরণ্য কখনো শূন্য থাকে না। ... কীট পতঙ্গ আর হিংস্র শ্বাপদ সেখানে নিয়ত যে...

তাড়া নেই। যাদের ঘর নেই, সেই সব ভবঘুরে বাউণ্ডুলে, যারা এই পথেই ঘুরে ঘুরে জীবন কাটিয়ে দিতে বসেছে। কেউ গেল আড্ডায়, জুয়ার ঘরে, বেশ্যালয়ে। কেউ কেউ শুধু পথে পথে ঘুরতে লাগল আর শিকারী চিলের মত দেখতে লাগল এদিক ওদিক। গন্ধ শুঁকে বেড়াতে লাগল বাঘের মত, একটু পেঁয়াজের, একটু আটার দলার, নিদেনপক্ষে একটু তাল-রসের।

অনেকক্ষণ পর ভাটা পড়তে থাকে ভিড়ে। দোকানপাটগুলিও ঝাঁপ ফেলতে থাকে অন্যান্য দিনের থেকে অনেক তাড়াতাড়ি।

বি টি রোড থেকে একটা কাঁচা সড়ক চলে গেছে পূবে। গোটা কয়েক ছোট বড় বাঁক নিয়ে, নিউ কর্ড রোড মাড়িয়ে গেছে রেললাইন পর্যন্ত। তারপর হারিয়ে গেছে মাঠে ও দূর দূরান্তের গাঁয়ে।

রাস্তাটা সরু। তার চেয়ে চওড়া, খালের মত নর্দমা কাঁচা রাস্তার দুপাশে। তাতে জল নেই, আবার একেবারে শুকনোও নয়। পাঁক জমে আছে দইয়ের মত।

রাস্তাটার নাম নয়া সড়ক করা হয়েছে এই সেদিন। যেন এতদিন পরে একটা ভবিষ্যৎ দেখা দিয়েছে সড়কটার জীবনে। নয়া সড়ক-ই বটে। বস্তির ভিড় এদিকটায় কম, কম তাই মানুষের ভিড়। একপাশ ধরে রাবিশ ফেলে ফেলে চওড়া করা হচ্ছে রাস্তাটাকে। মিউনিসিপালের কয়েকটা রাবিশ ও ময়লার গাড়ি কাঁধ নামিয়ে পড়ে আছে ধারে ধারে।

রাস্তার পাশে দু'চারটে চালাঘর উঠেছে পরস্পর থেকে অনেকটা ফাঁক ও দূরত্ব বজায় রেখে। কেবল নিউ কর্ড রোড ও নয়া সড়কের সঙ্গমে, এক ধারে এক লম্বা বস্তি। বেশ বড় বস্তি। বস্তিটার ধার ঘেঁষেই, কর্ড রোডের দিকে মুখ ফেরানো একটা হাল আমলের দোতলা বাড়ি। নয়া সড়কের বস্তি থেকে এ বাড়িটার দিকে তাকালে, একটা মস্ত অসামঞ্জস্যের দৃশ্যে হেসে ফেলতে পারে কেউ। তা একটা ঠাট্টা কিংবা একটি দর্শনীয় বস্তুর মত সাজানো রয়েছে

... ওটাকে ঘর বলে চিনতে না পারলে, মনে হতে পারে, ওটা একটা রাবিশেরই স্তূপ।

কিন্তু কর্ড রোড থেকে দোতলা বাড়িটিকে ভারী সুন্দর দেখায়। যেন ছবির মত।

মোড়ের এ বস্তিটা কিন্তু নয়া সড়কের থেকেও পুরনো। নয়া সড়ক যখন এক পাশে ধানের ক্ষেত আর অন্যদিকে বিস্তৃত মাঠের মাঝে একটা সরু গেঁয়ো পথ মাত্র ছিল, তখন এই বস্তিটা তৈরী হয়েছিল। এখন নয়া সড়ক শহরের সরিক হয়ে উঠছে। কিন্তু এ বস্তি বাড়িটা মান্ধাতা আমলের মত তেমনি পড়ে আছে। খোলা ছাওয়া চালা প্রায় মাটি স্পর্শ করেছে। মাথা হাঁটুতে ঠেকিয়ে বেরুতে হয় এখান থেকে। যেন উপর থেকে সমস্ত বস্তিটা ঝপ্ করে মাটিতে পড়ে প্রায় গেড়ে বসেছে। অন্ধকারে মনে হয় কালো এবং শেওলা ধরা খোলা সাজানো একটা স্তূপ বিশেষ।

একটা লোক পূব দিকের গভীর অন্ধকার কোল থেকে এসে মোড়ে দাঁড়াল। চারদিকের চারটে পথের দিকে সে কয়েকবার দেখল। কিন্তু কোন্ দিকে যাবে ঠিক না করতে পেরে ভূতের মত দাঁড়িয়েই রইল অন্ধকারে। থেকে থেকে দু-একটা গলার স্বর ভেসে আসছে ওই খোলার স্তূপটা থেকে। সেই স্তূপটার ধারেই এক জায়গা থেকে ছোট একটা আগুনের শিষ্ দেখা যাচ্ছে। যেন ফুঁয়ে ফুঁয়ে ঝিলিক দিয়ে উঠছে বিদ্যুতের মত। কর্ড রোড-মুখো ইমারতের একটা জানালা দিয়ে খানিকটা আলো এসে পড়েছে খোলার মাথায়।

সমস্ত পথটা অন্ধকার। আলো নেই পথটাতে, কিন্তু কতগুলি পোস্ট খাড়া করা আছে কিনারে কিনারে। যেন শুঁটকো হাড়গিলে ভূত দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে মাথা উঁচু করে।

থেকে থেকে আচমকা হাওয়ার ঝাপটায় ইলশেগুঁড়ি ছাটু রাস্তাটা ভিজে উঠেছে। কর্দমাক্ত সড়কটার এক একটা

আলোতেই চক্‌চক করছে।

লোকটা নয়া সড়কে এক পা এক পা করে এল, তারপর এগিয়ে গেল খোলার বাড়িটার দিকে। আসতে আসতে প্রায় চালাটার গা ঘেঁষে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ঘর-সংযুক্ত মাটির এব্‌ড়োখেব্‌ড়ো রক। একটা বাতি জ্বলছে সেখানে টিম্‌ টিম্‌ করে। রকের উপরে কিছু লোক রয়েছে শুয়ে বসে। দু-একজন বয়স্ক মেয়েমানুষও বসে আছে, তাদের পাশে শিশুও দেখা যাচ্ছে দু-একটি।

একজন শুধু বসে আছে খাটিয়ায়। তার খালি গা, কালো বর্ণ, শরীরটা মস্ত বড়। মাথা চাঁছা, মস্ত গোঁফ, গভীর কোঁচ নাকের পাশে। সারা গায়ে লোমের ছড়াছড়ি, ভ্রূর চুলে প্রায় চোখ ঢেকে গেছে। যেমন কথক্‌ ঠাকুর রামায়ণ মহাভারত শোনায় লোকজনকে, খাটিয়ার লোকটি তেমনি কথা বলে চলেছে। কথা বলার ভঙ্গিটা তার বড় অদ্ভুত। যেন সব কথাগুলোই সে বিদ্রূপ করে বল্‌ছে এবং সবাইকে হাসিয়ে বেশ আনন্দ পাচ্ছে লোকটা। কখনো গোঁফ পাকিয়ে, কখনো ভ্রূ তুলে কিংবা কুঁচকে, হাতের চেটোতে ঘুষি মেরে কিংবা খাটিয়ার বাঁশে তাল ঠুকে, আবার ভীষণ রেগে কথা বলছে। হাসছে না। কিন্তু কথাগুলো যারা শুন্‌ছে তারা হেসে উঠছে। াসছেও অবশ্য সসংকোচে, ভয়ে ভয়ে। কেননা হেসে উঠলেই অমনি পেটটা ঘোঁচ করে এক ধমকের হাঁকে চুপ করিয়ে দিচ্ছে সবাইকে। াতারাও অবশ্য সকলেই একনিষ্ঠ নয়। কেউ কেউ ঘুমিয়ে কাদা গেছে। কেউ কেউ হঠাৎ গুন্‌ গুন্‌ করে উঠছে এবং সেই গুন্‌- যেমনি নিজের কানে গিয়ে লাগছে থেমে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। গান যদি কোনক্রমে একবার বক্তার কানে যায়, অমনি সে কথা মিয়ে গায়কের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে।

য়ক তা বুঝতে পেরেই গান থামায়। কিন্তু বক্তা খুব গম্ভীর ায়িক গলায় বলে ওঠে, বাঃ বেশ তো গাইছিলি, গলা ছেড়ে ধর না াটা।

লোকে শুনলে ভাববে বক্তা নিশ্চয়ই গান রসিক, আর শুনতেও চায়। কিন্তু গায়ক আর রকের লোকেরাই শুধু জানে কেন তার হঠাৎ গানের এত তাগিদ। গায়ক তো বক্তার সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বাঁকানো গোঁফের দিকে তাকিয়ে কেবলি চোখ পিটপিট করে, মাটিতে নখ দিয়ে দাগ দেয়, গা মাথা চুলকোয় এবং আর সবাই তার দিকেই তাকিয়ে থাকে।

তখন খাটিয়ার বক্তা বলে ওঠে, গা না, গা শালা। কি সুখে গাই-ছিলি গা। সাধ করে বলি যে, তোরা জানোয়ার, অ্যাঁ? একটা কথা হচ্ছে, শুনছে সবাই, তা না ব্যাটা গান ধরে দিলে। না শুনিস তো যা, চলে যা ঘরে, শুয়ে থাক্ গে।

তারপরে যেন হাসছে এমনি দাঁত বের করে বলে, গ্যাখ গ্যাখ করছে গ্যাখ। বলতে বলতে সে কথান্তরে চলে যায়। বলি, তা হলে শোন্ এক গাইয়ের কথা বলি—

বলে সে এমনি গল্পে গল্পে গুল্‌জার করতে থাকে। কিন্তু শ্রোতারা বোধ করি সে রস গ্রহণে ঠিক সমর্থ নয়, আর নয় তো বলি এ শোনার মধ্যে কোন বাঁধাবাঁধি আছে যে, শুনতেই হবে ভাল লাগুক আর না লাগুক।

তার কথার মধ্যে বারবারই যেটা ফুটে উঠছে, সেটা হল জগতের সবটাই যখন মিছে, তখন মানুষের এত মাতামাতির কি আছে। নেই এবং নেই বলেই ওর গল্পের বিষয়বস্তু নাই থাক তার মধ্যে বারবার একজন নায়কই এসে দেখা দিচ্ছে আর মুখ থাবারি দিয়ে সে সবাইকে চুপ করিয়ে দিচ্ছে। তুলনা হিসাবে সে নিজেকে দেখিয়ে বলছে, এই আমি ওসব সইতে পারি নে। সব বুঝে নিয়েছি দুনিয়ার। যা দিয়ে পেট চলবে, সেটি কর, বাকীটা সব বাদ দাও। ল্যাঠা বাড়িয়ে কি দরকার বাবা। সুতরাং গায়কের গল্পের ওই ধরনের একটা পরিণতি দিতে গিয়ে তাকে আচমকা থামতে হয়। দেখে হয়তো কেউ ... থেকেই ঘুমের টানে গড়িয়ে পড়েছে, শিশু কেঁদে উঠেছে।

সে অমনি বলে ওঠে, বাঃ, তোর বাচ্চাটা কী সোন্দর কাঁদে।

কাঁদিয়ে দে ওকে।
যার শিশু, সে বেচারী ভারী ভড়কে গিয়ে তাড়াতাড়ি কান্না থামায়।
যে ঝিমিয়ে পড়ে তাকে বলে, আমার খাটিয়াতে শুবি আয়।
ঘুম পালায় অমনি সেখান থেকে।
অথচ লোকগুলির মুখ দেখে মনে হয় না যে তারা এরকম একটা খিটখিটে বা অদ্ভুত মেজাজের লোকের সামনে বসে আছে। বরং যখন কোন হাসির কথা হচ্ছে তখন বেশ হেসেই উঠছে হো হো করে। আগন্তুক একটু তাজ্জব হল ব্যাপারটা দেখে। ভারী মজার ব্যাপার তো!
রকের নীচেই একটা ছোট তোলা উনুনে একজন হাওয়া দিচ্ছিল। তারই সামান্য ফুলকি আগন্তুক দেখতে পেয়েছিল দূর থেকে। উনুনটা ধরে যেতে সেটাকে তুলে নিয়ে উঠবার মুখে লোকটা হঠাৎ আগন্তুককে দেখতে পেল। জিজ্ঞাসা করল, কে হে ওখানে?
আগন্তুক হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না।
লোকটা আবার বলল, নীচে দাঁড়িয়ে কেন, রকে উঠে বস না।
সকলের দৃষ্টি আগন্তুকের দিকে পড়ল। অচেনা মুখ দেখে সবাই তাকিয়ে রইল তার দিকে।
খাটিয়ার বক্তা মেজাজী গলায় হেঁকে উঠল, কে রে চাঁদু?
চাঁদু উনুন নিয়ে রকে উঠে বলল, চিনি নে, দেখলুম ডাঁইড়ে রয়েছে ওখানে।
কে হে? উঠে এস এখানে। চড়া গলায় হুকুম করল বক্তা।
আগন্তুক উঠে এল রকে। তার মুখে বিন্দুমাত্র ভয় বা সংকোচের আভাস নেই বরং তার ঠোঁটে মিটমিট করছে একটা চাপা হাসি। বয়সে জোয়ান, একমাথা বড় বড় চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। মুখের ছাঁদটি লম্বাটে, কোলবসা চোখ দুটোতে সরল আর হাসি-হাসি ভাব মাখা। গায়ে মাত্র একটা গলাবন্ধ হল্‌দে গেঞ্জি, কাপড়টা হাঁটু থেকে একটু উপরে তোলা। একটা চটের থলি লাঠির ডগায় বাঁধা। লোমশ ভ্রূর তলায় প্রায় ঢাকা পড়া বক্তার চোখজোড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

একবার আগন্তুকের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে যথাসম্ভব বক্র ঠোঁটে জিজ্ঞাসা করল, কী হচ্ছিল ওখানে।

যদি লোকটার কথাবার্তা হাবভাব কিছুক্ষণ আগেও আগন্তুক না দেখত শুনত, তাহলে ওই মুখের সামনে দাঁড়িয়ে চট করে কথা বলতে আটকাত। সে বলল, এই শুনছিলাম হুজুর আপনার গালগপ্প।

'হুজুর আপনার গালগল্প' কথাটা শুনে বক্তা ঘাড় বাঁকিয়ে আরও তীব্র চোখে তাকে দেখে নিল। অর্থাৎ লোকটা তাকে পরিহাস করছে কিনা বুঝে নিল সেটা। বলল, তা এদিকে কী মনে করে।

আগন্তুক একটু উশখুশ করে জবাব দিল, শহরে যাবার রাস্তাটা খুঁজছিলুম। যা আঁধার পথ। ভেবেছিলুম ইদিক দিয়ে রাস্তা টাস্তা হতে পারে।

এদিকে হতে পারে? বলতে বলতে বক্তার মুখ আরও বিকৃত হয়ে উঠল। বলল, আর খানিক রাত করে এলেই ভালো হত, বেশ পথটথও সব আপনা আপনিই দেখা যেত। যা দু'চারটে ঘটি বাটি কাপড়চোপড় চটপট উঠে পড়ত তোমার হাতে। এখনও তো সব জেগে আছে।

অর্থাৎ আগন্তুককে সে চোর ঠাউরেছে। সকলে ফিকফিক করে হেসে উঠল। আগন্তুক দেখল সেই মাটির দেওয়ালের ঘরগুলো থেকে আরও কিছু নতুন মুখ দেখা দিয়েছে। সেও মিটমিট করে হেসে সবাইকে একবার দেখে জবাব দিল, হেঁ হেঁ হুজুর। সবাই তো পেরায় ল্যাংটা এখানে, কার কি চুরি করব?

সেই আলো-আঁধারিতে ভূতের মত মানুষগুলোর কেউ কেউ হঠাৎ হেসে উঠল সেকথা শুনে। কেউ কেউ একটু অতিরিক্ত কৌতূহলে কাছে এসে দেখল তাকে। কেউ কোমরে হাত দিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে। দু-একজন অল্পবয়স্কা মেয়ে বউও দেখে নিল তাকে হেসে হেসে ঠেরে ঠেরে।

একজন বলে উঠল, বেড়ে চালু দেখছি।

কে আর একজন বলে উঠল, ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দে, কাল

থেকে ওকে আমার মাদারি খেলায় নিয়ে যাব। বেশ কাজ দেখাতে পারবে। একেবারে ফাস্ কেলাস্।

মাদারি খেলার অর্থ হচ্ছে বাজিকরী খেলা। ধুলো থেকে চিনি করা, কান মুচড়ে ডিম বের করা, আর রুমাল ঝেড়ে উড়িয়ে দেওয়া জোড়া পায়রা। তবে এর চেয়েও বড় কৃতিত্ব হল অদ্ভুত বক্তৃতায় ও ঢঙে এক হাতে ডুগডুগি ও আর হাতে আড় বাঁশী বাজিয়ে জনতার জমায়েত ও তাদের এক রহস্য উদ্‌ঘাটনের রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় চাকের মৌমাছির মত জমিয়ে রাখা।

আগন্তুক বলে উঠল তেমনি হেসে, তা দাদা, একটা কাজ কাম পেলে তো বর্তে যাই।

খাটিয়ার বক্তার লোমশ শরীরটা নড়েচড়ে উঠল একটু, তারপর প্রায় হুংকার দিয়ে বলে উঠল, হুঁ! কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

তা অনে-ক দূর?

বক্তা তার গলার স্বরটা অনুকরণ করে বিকৃতমুখে ভেংচি কেটে বলল, কত্ত—দূর? সাতসমুদ্দুরের ধার থেকে?

আগন্তুক বিনীত হেসে জবাব দিল, না ইছামতির পাড়, ইটিণ্ডেঘাট থেকে।

বক্তার গোঁফজোড়া আরও খানিক বেঁকে গিয়ে চোখ দুটো প্রায় ঢেকে গেল। কী জন্য এসেছ?

এই কাজ কামের ফিকির টিকিরে।

কী কাজ জানা আছে?

ছুতোরের। জাতও ছুতোর, কাজেও তাই।

কে একজন বলে উঠল, ও জাতের সঙ্গে শালা কারো বনে না। ওদের ঘরেরই ঠিক থাকে না। কথায় বলে,

ছুতোরের তিন মাগ
ভানে কোটে খায় দায়
থাকে থাকে যায় যায়

খালি কাঠে কাঠে গুঁতোগুঁতি।

আগন্তুক বলল, হেঁ হেঁ কাঠে কাঠে বলেই থাকে থাকে যায় যায়, কিন্তু যায় না। ঐ মজা আর কি! তবে অভয় পেলে একটা কথা বলি।

বল।

বলছিলুম, আমার নিজের মাগ তার ছেলেপুলে নিয়ে অনেক দিন সগ্‌গে গেছে। পরের চেয়ে একটু নিজের ঘরের দিকে নজর রাখা ভালো। নইলে—

সকলেই হেসে উঠল তার কথায়। মেয়েরা একটু বেশী হাসল। বক্তা সবাইকে ধমকে উঠে বলল, আর কোন পেশা আছে?

নেই। তবে ইয়ার দোস্তরা বলত চারশ বিশ, মানে ফোর টুয়েন্টি।

এবারে হাসির শব্দটা আরও জোরে বেজে উঠল।

ফোর টুয়েন্টি হচ্ছে ভারত সরকারের একটি আইনের ধারা, প্রতারণার দায়ে তা আরোপ করা হয়। কথাটা কোন কোন মহলে, বিশেষ করে কলকারখানা এলাকায় খুব বেশী শোনা যায়। কথায় কথায় বলে, অমুকে ফোর টুয়েন্টি করে দিয়েছে, অর্থাৎ ধোঁকা দিয়েছে।

একজন বলে উঠল, বস, বসে পড় ভায়া, আজ বর্ষার রাতটা তোমাকে নিয়েই কাটিয়ে দিই।

খাটিয়ার বক্তার ভুঁড়ি যেন একটু কাঁপল, গোঁফ যেন একটু উঠল। বলল, ফোর টুয়েন্টি কেন বলে?

আগন্তুক বলল, হুজুর, ওই দায়ে মাস তিনেক জেল খেটেছিলুম। এক কাঠের গোলায় কাজ করতুম, সে গোলার মালিক ধরিয়ে দিয়েছিল।

আর কিছু জানা আছে?

রসিক আগন্তুক এবার একটু চুপ থেকে মিট্‌ মিট্‌ করে হাসতে লাগল। দেখল সকলেই প্রায় তার দিকে হাসিমুখ নিয়ে তাকিয়ে আছে। কেবল খাটিয়ার ওই দানবীয় মূর্তির মুখভাবও যেমন বোঝা যাচ্ছে না, তেমনি ধরা যাচ্ছে না তার মনের হদিসটা। তবু আগন্তুকের সেই প্রথম থেকেই কেন জানি মনে নিয়েছে, লোকটা শুধু রসিকই নয়, মনটা ও প্রাণটা তার দরাজ। একটু যা হুজুর কর্তা ভাব, মেজাজটা একটু বা চড়াভরা। কিন্তু মানুষটা ভালো।

সে বলল, আর যা জানা আছে সবই অকাজের। হুজুরের তা পছন্দ হবে না।

তবু শুনি?

এই একটু গান-টানের সখ আছে, গল্প সল্প বলতে পারি।

হুঁ। বলে বক্তা এক মুহূর্ত আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে রইল।

জিজ্ঞেস করল, নাম?

গোবিন্দচন্দ্র শর্মা।

অন্যান্য লোকেরা গোবিন্দের দিকেই দেখছিল। সকলেরই কেমন একটু ভালো লেগে গিয়েছিল তাকে। চটকল শহরে দৈনিক কত লোকই আসে এবং যায়। দু-দণ্ড বসে কথা বলে যায়। দূরের খবর দিয়ে যায়, নিয়ে যায় এখানকার খবর। সুযোগ পেলে ঢুকে পড়ে কোন কারখানায়, থেকে যায় ঘরভাড়া নিয়ে। এরকম অনেক লোককে তারা দেখেছে। দেখতে দেখতে সে মানুষ আবার পুরনোও হয়ে গেছে। আবার এসেছে নতুন মানুষ।

কখনও কখনও বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত আসে ছাঁটাই। তখন দলে দলে মানুষের মিছিল এখান থেকে চলে যায় অন্যান্য জেলায় প্রদেশে নানান কাজে। ঠিকে কাজে, কণ্ট্রাক্টরের কাজে, কোথাও পুল তৈরী বা রাস্তা গড়তে, দূর গ্রামাঞ্চলে কৃষিমজুর খাটতে।......

আবার আসেও।

কিন্তু এরকম লোক তারা দেখতে পায় খুব কম।

একজন বলল, কাজটাজের আশা ছেড়ে দেও, কোন কলে একটা কাকপক্ষীও ঢুকতে পারছে না। গেটের মুখে রোজ গাদা ভিড় লেগে থাকে, আর দারোয়ানের খেউড় শুনে, গুঁতো খেয়ে সব ফিরে যায়।

গুড় গুড় করে মেঘ ডেকে উঠল আকাশের কোন্ দূর থেকে। বার কয়েক বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠল মেঘের বুক চিরে। সোঁ সোঁ করে মত্ত হাওয়া ঝাপ্‌টা দিয়ে গেল খোলার চালায়।

সকলেই চুপচাপ। হাওয়ায় বাতির শিশটা কেঁপে কেঁপে উঠল,

মাটির দেওয়ালের গায়ে সকলের ছায়াগুলো কিম্ভূতকিমাকারের মত উঠল দুলে দুলে।

খাটিয়ার বক্তা বলল, বস না কেন ঝোলাঝুলি নামিয়ে। এই ঝড় জল মাথায় করে কোথা যাবে এখন ?

গোবিন্দ একবার বাইরের অন্ধকার আকাশের দিকে দেখে বলল, আজকের ঝড় তো কালকেও থাকতে পারে। মাথায় করে বেরুনো ছাড়া কি কোন গতি আছে হুজুর ?

তুমি হুজুর বলছ কেন হে ? হঠাৎ বক্তা এবার চড়া গলায় জিজ্ঞেস করল।

গোবিন্দ আবার মিট্‌মিট্‌ করে হেসে বলল, দেখে শুনে হুজুর হুজুর মনে নিল, তাই বলছি।

মেজাজী গলায় বক্তা বলল. আমি হলুম বাড়িওয়ালা, এ বাড়ির মালিক। হুজুর টুজুর নই, বুঝেছ ?

গোবিন্দ তবু বলল, মালিক মানেই তো হুজুর। এত লোকজন যার, কথায় বলে…

বক্তা আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। লোকটা তাকে ঠাট্টা করছে নাকি ? না, সেরকম কিছু ধরা যায় না।

বলল, হ্যাঁ, এখানে আমার হুকুম ছাড়া কারো হুকুম খাটে না। আমার জমি, আমার ঘর, এখানে আইনও আমার।

বলে গোঁফটা বেশ করে পাকিয়ে তুলে বলল, আর দশজন বাড়িওয়ালার মত আমি ছিঁচকে নই। আমার কাছে কোন অন্যায় পাবে না, আবার বেশী তেরিমেরিও চলবে না। ট্যাঁ ফোঁ করলে দূর করে দিই গলা ধরে। আমি কারো ধার ধারি না। বুঝবে, দিনকতক থাকলেই বুঝতে পারবে।

গোবিন্দ চকিতে একবার বাড়িওয়ালার মুখের দিকে দেখে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, থাকব না যখন তখন আর বোঝাবুঝির কি আছে।

বাড়িওয়ালা ভ্রূ কুঁচকে চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর মুখ তুলে

চোখ বুজে বলল, কালো।

কাছেই একটি আধবুড়ো লোক বসেছিল। বলল, বল।

তুই না কোথা কাজ পাবি বল্‌ছিলি?

হ্যাঁ।

কবে থেকে?

পরশু থেকে।

তখন বাড়িওয়ালা বলল গোবিন্দকে, দেখ, তোমার যখন পেছনে কোন লেঙ্গিগেঙ্গি নেই, আর তোমার হাড়ে যদি কুলোয়, তবে তুমি আমাদের রান্না করতে পার।

গোবিন্দ কালো এবং আর সকলের মুখের দিকে একবার দেখল।

এসব বস্তিতে ঠিক হোটেল নয়, তবে ঐ রকম একটা নিয়ম আছে। যারা পরিবার নিয়ে থাকে তারা সাধারণতঃ নিজেরাই রান্না করে খায়। বাদবাকীরা এক জায়গায় তাদের বন্দোবস্ত করে নেয়। তার মধ্যেও অবশ্য মেয়েপুরুষ সবরকমই আছে। কলে-খাটা মেয়েদের অনেকে রান্নার ঝুঁকিটা নিতে চায় না: যারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কারখানায় কাজ করে তারাও কারো হাঁড়িতে নাম লেখায়।

গোবিন্দ একটু চিন্তা করে এর ওর মুখ দেখল, বাইরের দিকে দেখল একবার, তারপর লাঠির ডগা থেকে চটের থলেটা খুলে ফেলল।

একজন জড়ানো গলায় বলে উঠল, শালা ছুতোরের হাতে খাওয়া। দেখো বাবা, ভাতগুলো করাত দিয়ে চিরোনি।

প্রৌঢ়া সদী কেশো গলায় হি হি করে হেসে বলল, আর হাতুড়ি-বাঁটাল দে সব চেঁছে পুঁছে উনুনে দে বসে থেক না।

আর রান্না খারাপ হলে হাঁকড়াব তুই কোঁত্‌কা, একেবারে ইটিণ্ডেঘাট পাঠিয়ে দেব আবার। নগেন মোটা গলায় বেশ টেনে টেনে কথাগুলি শুনিয়ে দিল।

গোবিন্দের মুখে হাসিটি লেগেই ছিল। সেই হাসিটির জন্য কোন কারণে বা কথাতেই তাকে হঠাৎ অপ্রতিভ মনে হয় না। ওই হাসিটুকু

থাকে। কিন্তু কথাগুলি শুনে একটু ঘাবড়ে গেছে সে। তবু বলল, তা এ তো তোমার আর মিশিনের কারবার নয়! আজ একটু লুনকাটা কাল একটু বোদা পান্‌সে এ তো হবেই। আর পরশুর কথাটাই বা বাদ যায় কেন? বল সেদিনে পুড়িয়ে সব ছাই খেতে দেবে। হরি বলল, ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি নিয়ে। বাদবাকী সকলেই টিপে টিপে হাসতে লাগল।

গোবিন্দ বুঝল এদের বন্ধুত্ব সে ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে তাই এত সহজে সবাই তাকে নানান্ কথা বলছে। বলল, তা নতুন নতুন দু-দিন একটু অসুবিধে তো হবেই। কোনদিন তো আর···

বলতে বলতে থেমে গেল সে। যেন হঠাৎ তার কিছু মনে পড়েছে এবং মুখে সেই লেগে থাকা হাসিটুকু নিয়েই শূন্য দৃষ্টিতে ক্ষণিক তাকিয়ে রইল লম্ফটার দিকে।

বাজিকর বলে উঠল, যদি কোন বন্ধক ঠেকায় পড়ে যাও তো, আমার কাছে চাইবে, আশমান থেকে পেড়ে দেব।

কে যেন আস্তে আস্তে বলে উঠল, বউয়ের ঠেকায় পড়লেও।

গোবিন্দ তাকিয়ে দেখল কথাটা বলেছে ষণ্ডামার্কা নগেন, আর মেয়েরা হাসছে খিলখিল করে।

বাড়িওয়ালা বলল, আর ওইসব গান-গপ্প কি সব বল্‌ছিলে, ওসব বিলকুল চলবে না। ওসব হল আনাড়ী লোকের কাজ।

গোবিন্দ বলল, কোন লেখা-পড়া তো নেই।

প্রায় ক্ষেপে উঠে বলল বাড়িওয়ালা, এই আমার কথাই লেখাপড়া। নড়চড় হলেই একদম গেটআউট।

কালো বলল, গেঁয়ো হলেও রসিক আছে দেখছি। বলে বাড়িওয়ালার দিকে তাকিয়ে বলল, তাহলে—

হ্যাঁ—বানা এক কলকে, বর্ষাটা নইলে জম্‌ছে না। বাড়িওয়ালা পিট-পিট করে একবার গোবিন্দকে ভ্রূর তলা থেকে দেখে নিল।

কালো চোখ টিপে গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করল, চলে নাকি?

গোবিন্দ এবার পা ছড়িয়ে বসে বলল, অভ্যেস টভ্যেস নেই, তবে দু-দিন থাকলেই চলবে।
কালো গাঁজা ডলতে ডলতে বলল, ঘুরে ঘুরেই দিন কাটে বুঝি, নইলে যখন যা তখন তা চলবে কেন।
গোবিন্দ বলল, দিনকালটাও দেখতে হবে তো। তা তোমার খ্যানায় থাকলে খ্যানার মত, ডোবায় থাকলে ডোবার মত। তখন কি আর জলে কাদায় ঘিনঘিন করলে চলে।
এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে একটা গালাগালির, চিৎকারের ও মারধোরের শব্দ উঠল। অমনি বাড়িওয়ালা লোমশ বৃহৎ বপু ঝাড়া-পাড়া দিয়ে উঠে বলল, সে দু-হারামজাদা লেগেছে, না?
কালো বলল, তাছাড়া আর কারা?
বাড়িওয়ালা তার মস্ত শরীরটা নিয়ে বনমানুষের মত প্রায় একটা অন্ধ সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেল। কালোও উঠল। গোবিন্দকে বলল, আর বাইরে কেন, চল ভেতরে।
কালোর পেছনে পেছনে গোবিন্দ সন্তর্পণে সেই দু-পাশে মাটির দেওয়ালের সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে ভিতরে এসে পড়ল।
গোবিন্দ দেখল ভিতরে বাইরের চেয়েও তিনগুণ মেয়েপুরুষের ভিড়। উঠোনটাও লম্বা মন্দ নয়। তবে চওড়া একটু কম এবং তার সমস্তটাই কাদায় থিক্ থিক্ করছে—যাতায়াতের জন্য মাঝে মাঝে পাতা রয়েছে ইট। সেই উঠোনটার চারপাশেই ঘর। ঘরে ঘরে লম্ফ নয় তো দলা পাকানো পাটের ফেঁসো মশালের মত জ্বলছে।
বাড়িওয়ালা তার শক্ত দু-হাতে দুটো জোয়ান ছোকরাকে ধরে রেখেছে। ছোকরা দুটো তবু তড়পাচ্ছে, পরস্পরের প্রতি খিস্তি করছে, হামলে হামলে উঠছে যেন দড়ি দিয়ে বাঁধা দুটো ষাঁড়ের মত।
কিন্তু যারা ভিড় করে আছে তাদের সকলের চোখ পড়ে আছে অন্যদিকে। যে ঘরের সামনে ঘটনাটা ঘটছে, সে ঘরের দরজার সামনে যে মেয়েমানুষটি নির্বিবাদে এবং কারোর দিকে না তাকিয়ে

নিজের কাজ করে যাচ্ছে, সবাই সেদিকেই তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে।

গোবিন্দের পাশ থেকে কালো বলে উঠল, ওই মাগীটাই শালা যত গণ্ডগোলের গোড়া।

কথাটা কানে যেতে মেয়েমানুষটি খোঁচা খাওয়া সাপের মত চকিতে জ্বলন্ত চোখে ফিরে তাকাল।

গোবিন্দের মনে হল সাপই বটে। চোখ দুটি কিঞ্চিত গোল এবং তার সে চোখের কোন পাতা নেই। নাকের পাটা দুটো বিস্তৃত ও মোটা। শরীরটা বেখাপ্পা লম্বা তালগাছের মত। একটা ফর্সা কাপড়ে যথেষ্ট ফিটফাট হলেও তার সমস্ত ভঙ্গিতে একটা নিষ্ঠুর কদর্যভাব ফুটে রয়েছে। তার মোটা মোটা ঠোঁট দুটো টিপতে গিয়ে তা আরও ছুঁচলো হয়ে উঠেছে এবং সে ছুঁচলো ঠোঁটের উপরেই পুঁতির ছোটখাট নোলকটি নড়ে নড়ে উঠছে ক্রুদ্ধ নিশ্বাসে।

বাড়িওয়ালা চিংকার করে উঠল ছোকরা দুটোর প্রতি, থাম্, শালা ষাঁড় কাঁহিকা।

কিন্তু ছোকরা দুটো যেন মেশিনে ফিট করা পিস্টন রড। ওরা কেবলই পরস্পরের প্রতি এগিয়ে আসে আর শক্ত হাতের টানে ফারাক হয়ে যায়।

তখন বাড়িওয়ালা তাদের পরস্পরকে হঠাৎ হ্যাঁচকা টানে খটাস করে কপালে কপাল ঠুকে গর্জে উঠল, তো লড় দেখি, কত লড়বি। আমিই লড়াচ্ছি তোদের।

বলে একটাকে কশাল ঘাড়ে এক রদ্দা, আর একটাকে কশাল পাছা বেড়ে এক জোড়া ঘুষি।

তখন দুটোই ঝপ্ করে বসে পড়ল মাটিতে। সকলে বলে উঠল, শালারা ঠাণ্ডা হল এতক্ষণে।

তবু তারা বাড়িওয়ালাকে মধ্যস্থ করে পরস্পরের প্রতি নালিশ করতে লাগল।

কিন্তু বাড়িওয়ালার নজর তখন গিয়ে পড়েছে সেই মেয়েমানুষটির

উপর। বলল, এই গ্যাখ লোটন বউ, তোকে আমি হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, এখানে খ্যামটা খেলা চলবে না।

লোটন বউ তার সেই পাতাহীন ঈষৎ গোল চোখে কুটিল দৃষ্টিতে চেয়ে শান্ত ক্রূর গলায় জিজ্ঞেস করল, কী খেলা খেলতে হবে?

কোই খেলা নহি মাংতা। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ার মত ছু-পা এগিয়ে তার রোষকুঞ্চিত ভ্রূর তলায় চোখ ঢেকে হিসিয়ে উঠল বাড়িওয়ালা, অওরত বলে খাতির নেই। বেশী বেচাল হলে—

মারবে? নির্মম শ্লেষে ঠোঁট উল্‌টে লোটন বউ তার তালগাছের মত শরীরটা একটা বিচিত্র দোলানীতে এগিয়ে নিয়ে এসে বলল, মার না দেখি একবার, কত তোমার তাগদ।

বাদবাকী মেয়ে পুরুষ সকলেই প্রায় রুদ্ধশ্বাস অস্বস্তিতে লোটন বউ ও বাড়িওয়ালাকে দেখছিল।

বাড়িওয়ালার মুখের ও গলার সমস্ত পেশীগুলো মোটা দড়ির মত ফুটে বেরুল, গোঁফের পাশ দিয়ে দুটো ক্রূর রেখা উঠল কেঁপে কেঁপে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, যেদিন পাকড়াব, তোর টুঁটি ছিঁড়ে কুত্তার মুখে ফেলে দেব।

তারপর পেছিয়ে এসে সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, হারামজাদী ডাইনী। অওরত যখন শয়তান হয়, তখন তার চালটা কি রকম হয় একবার দেখ।

আরও নির্মমভাবে বলে উঠল লোটন বউ, আরে যাও যাও, তোমার মত ভালো চালের আদমি আমি ঢের দেখেছি। এবং তার সেই কথায় কোন প্রতিক্রিয়া শুরু হওয়ার পূর্বেই সে হঠাৎ ডাক ছেড়ে প্রায় মরা কান্না জুড়ে দিল। তাকে কান্না না বলে বলা চলে জেদী গলায় চিৎকার করে উঠল, আরে আমার তকদির····· আরে আমার দিলটুটানো মিনসে, এমন দুশমনের কাছে তুমি আমাকে ছেড়ে গেছ। দেখ এসে একবার এরা তোমার অওরতকে আজ কেমন বে-ইজ্জতটা করছে।

এ ঘটনার এই হল দৈনন্দিন শেষ।

বাড়িওয়ালা তবু চিৎকার করে উঠল, তুই পারিস্‌নে এই ষাঁড় দুটোকে ঠিক রাখতে—অ্যাঁ, পারিস্‌নে? রোজ শালা এক ব্যাপারে, কাঁহাতক পারা যায়।

লোটন বউ সেই কান্নার ফাঁকেই চিলের মত চেঁচিয়ে উঠল, আমি পারব না। ওরা জাহান্নমে যাক্। আমার কেউ নেই···সবাই দুশমন···

বস্তির মেয়েরা প্রায় সকলেই গজগজ করছিল, পুরুষেরা সকলেই হাসছিল মজা পেয়ে। কিন্তু এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে লোটন বউয়ের জিভ্‌কে সকলেই কমবেশী ভয় করে।

ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন করুণাময় তুতু শব্দ করে হঠাৎ বেস্থরো গানের ভঙ্গিতে বলে উঠল,

ওহো, কেয়া, বে-দরদ্ নানী, সব্‌কো দরদ্ বনা দে।

একটা চাপা হাসির হুস্ হুস্ শব্দে জায়গাটা মুখরিত হয়ে উঠল।

যে ছোকরা দুটো মার খেয়ে বসেছিল, তারা এতক্ষণ চুপচাপ গোল গোল চোখে সব দেখছিল এবং শুনছিল। এবার তারা আস্তে আস্তে দুজনেই লোটন বউয়ের কাছে গিয়ে বসল আর বিড়বিড় করতে লাগল সান্ত্বনার স্থরে, ছোড় দে···চুপ যা।

লোটন বউ তখন আঁচলে মুখ ঢেকে বাপ মা শ্বশুর স্বামী সবাইকেই স্থর করে শাপ-শাপান্ত করে চলেছে এবং তার এই দুর্ভোগের জন্য যারা দায়ী তাদের সাতপুরুষের নরক বাস হয়, ভগবান যেন তার এই মিনতি রাখে। তারপর ছোকরা দুটোর বিড়বিড়ানি আর সইতে না পেরে হঠাৎ তাদের ঘুষি থাপ্পড় মেরে চুল টেনে, খিস্তি খেউড়ের ঝড় তুলে ঘরে ঢুকে দড়াম্ করে দরজাটা দিল বন্ধ করে।

কালো গোবিন্দকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল, চলে এস ইয়ার, এ রোজকার ব্যাপার।

গোবিন্দ জিজ্ঞেস করল, ব্যাপারটা কি?

কালোর বক্তব্য থেকে বোঝা গেল, এই ছোকরা দুটো মৃত লোটনের ভাই হরিশ আর নন্দ। বউটা হল লোটনের বিধবা বউ। প্রথম

কথা হচ্ছে বউটা নিশ্চয়ই খারাপ। খারাপ না হলে ছুটো দেওরকেই মজালো কেন। আর তাই হয়েছে কাল। এখন ছোঁড়া ছুটো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি করে মরছে, বউটা বেশ বহাল তবিয়তে তাই দেখছে। সে যদি ঠিক থাকত তবে এবকম কিছুতেই ঘটতে পারত না।

গোবিন্দ বলল, তা, বউটার কোন দোষ তো নাও থাকতে পারে।

কালো হেসে উঠল বিদ্রূপের স্বরে। বলল, যে কোন মরদই মেয়েমানুষের দোষ দেখতে পায় না। দু-দিন যাক্ তখন টেব পাবে। এ সাবা মহল্লার মানুষ ওকে চেনে……তুমি কি ভেবেছ ও বাত-ভব দরজা বন্ধ করে রাখবে? ঠিক কখন খুলে দেবে। তবে বল, যদি াচ্চা হবে তো শালী কেন দবজা খুলে দেবে আর ওই জানোয়াব দুটোকে ঘবে তুলবে?……আর আমি তো শালা কোন ছাব, মাইরি ভগবানও জানে না কি করে ওদেব রাত কাটে।

বলতে বলতে সে দারুণ বিতৃষ্ণায় ও হতাশায় হাত ঝটকা দিয়ে ফিস্ ফিস্ কবে উঠল, সব শালা এলাকার দোষ, এ চটকল এলাকা! এখানে সব দুনিয়া ছাড়া কারবাব, এখানে মানুষ নেই।

গোবিন্দ বলল, বাড়িওয়ালা ওদের ভাগিয়ে দেয় না কেন?

ও তো পাগল! কালো গলার স্বর পাল্টে চাপা গলায় বলল, নয় তা ওকে কেউ শালা গুণতুক করেছে। ওব কথা, ওর মেজাজ ভূত াড়া কেউ জানে না।……সবাই বলে ওদেব ভাগিয়ে দিতে, াড়িওয়ালা বলে, তাতে কী লাভ! আমার এখান থেকে চলে গেলে কি ওদেব এসব খেয়োখেয়ি থেমে যাবে? ওদের এখানে বেখেই এসব বেতমিজি ঠাণ্ডা করতে হবে।…বোঝ ঠ্যালা।

গোবিন্দ অবাক হলেও বাড়িওয়ালার প্রশ্নটা হঠাৎ যেন তার কাছে স্ত একটা আচমকা আলো-আঁধারির ঝাপসা রেখার মত দুলে উঠল। বচিত্র সমস্যা ও নিছক সত্য কথা। কিন্তু কী এর বিহিত।

াওয়ার ঝাপটায় আবার ফিস্ ফিস্ করে জল নেমে এল। হাওয়াটা ীতিমত শীত ধরিয়ে দেয়। মেঘের গ্রাসে সমস্ত আকাশটা এখনো

কালো।
বস্তিটার মধ্যে একটানা চলেছে গান, কান্না, কথা। বিরামহীন এ হট্টগোলের মধ্যে মনে হয় যেন মাটির দেওয়ালে আড়ালকরা হঠাৎ কোন বাজারের মধ্যে এসে পড়া হয়েছে। তখনও পর্যন্ত লোটন বউয়ের অধ্যায় নিয়েই কিচিরমিচির হাসি ঠাট্টা গালাগালি চলছে। সমস্ত গোলমালকে ছাপিয়ে একটা গুরুগম্ভীর বুড়োটে গলায় গিটকিরি বহুল গান ভেসে এল,

মন আমার নির্বাণ নগরে যদি যাবে,
সমভাব ভাব সবে।……

গোবিন্দের থমকানি দেখে কালো তার হাত ঝাঁকানি দিয়ে বড় বড় চোখে বলে উঠল, এই মরেছে, তুমি এসব ফালতু কথা ভাবছ? তার চে গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভালো। ছেড়ে দেও এসব, যাও হাতমুখ ধুয়ে এস।
গোবিন্দ সত্যিই হয়তো কিছু ভাবছিল। বলল, হ্যাঁ, কোথায় জল-টল পাব?
জল আর কোথায় পাবে। নয়া সড়কের মোড়ে একটা কল আছে। সেটা তো অনেক দূরে। বলে উঠোন থেকে বাড়ির ধার ঘেঁষা দোতালা বাড়িটা দেখিয়ে বলল, বাইরে দিয়ে ওই বাড়িটার পেছন দিকে যাওয়ার গলিতে যাও, নর্দমার জলে হাত পা-টা ধুয়ে এস।
নর্দমার জলে? গোবিন্দ একটু অবাক হল। নর্দমার জল কেন?
সে তো বস্তিবাড়ির জল নয়, ওই বাড়িটার যে জল নর্দমা দিয়ে যায়, সেই জল। খুব সাফা আছে নর্দমাটা। খুব স্বাভাবিকভাবেই বলল কালো কথাগুলি।
তোমরা সে নর্দমায় হাত পা ধোও?
তবে কি হরবখত ওই সড়কের কলে যাবে?
গোবিন্দ তার জীবনে অনেক জায়গায় ঘুরেছে, মানুষ দেখেছে অনেক, জানে কিছু কিছু অনেকের অনেক হালচাল। সে এও দেখেছে ময়লা-খাটা মেথর ঝপ্‌ করে নর্দমার জলে হাত ধুয়ে বেমালুম ডালপুরি

কিনে খায়। কিন্তু এরকমটা দেখেনি। সে বলল, পুকুর নেই কোথাও কাছে পিঠে?

না।

কিন্তু গোবিন্দ নর্দমার জলে হাতমুখ ধুতে গেল না। সে তার ঝোলা ও লাঠি কালোর হাতে দিয়ে নয়া সড়কের জলকলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

খেতে বসেছে সকলে। কিন্তু কেউই সারিবদ্ধভাবে বসেনি। অল্প একটু জায়গার মধ্যে সকলেই প্রায় বসেছে জবুথবু হয়ে। এ্যালুমিনিয়াম বা লোহার থালা সকলের হাতে।······জায়গাটা অন্ধকার, একটি মাত্র রেশ এসে পড়েছে রান্নাঘরের লম্ফটার। কালো রয়েছে রান্নাঘরে। যে যার থালা নিয়ে দরজায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে আর খাবার নিয়ে বসে পড়ছে পাশাপাশি। বাড়িওয়ালাও তাদের সঙ্গেই বসেছে, একটু দূরে রান্নাঘরের দরজাটার কাছেই।

গোবিন্দ একটা অন্ধকার কোণ থেকে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখছিল। সকলেই প্রায় চুপচাপ খাচ্ছে। খাওয়ার, জিভ্ নাড়ার ও হাত চাটার হুস্‌হাসের সঙ্গে অসমান কাঁচা মেঝেয় থালার ঠক্ ঠক্ শব্দের এক বিচিত্র ঐকতান উঠেছে। মাঝে মাঝে কেউ কেশে উঠছে বা কথা বলে উঠছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, এখানে বুঝি কোন মানুষ নেই, শ্মশানের বটতলার ঝুপসিতে একদল প্রেত নিঃশব্দে ফলারে বসেছে।

কে একজন আচমকা নিশ্বাস ফেলে বলে উঠল, যাঃ শালা, থালা সাফ হয়ে গেছে।

অমনি একজন হি হি করে হেসে উঠে বলে, আন্ধারে খেতে বসার মজা আছে। কখন যে সব ফুরিয়ে যায়।

দীর্ঘ পথ হাঁটা ক্লান্ত গোবিন্দের পেটভরা ক্ষুধা যেন একটা পাক খেয়ে থম্ ধরে গেল। এই অতৃপ্ত ক্ষুধার আবহাওয়ায় যেন বর্ষার অশান্ত

হাওয়ার বেগও থেমে গেছে, মেঘ অনড় হয়ে গেছে আকাশে।······
উপোস এক কথা কিন্তু খেতে বসে ক্ষুধার অতৃপ্তি আর এক কথা।
একি হাভাতের আস্তানায় উঠেছে সে। মনটা তার বারবার বলে উঠল, চলে যেতে হবে, এখান থেকে।
কিন্তু কোথায়! পেছনে ফেলে আসা জীবনটা এক বিদ্রূপের খল্‌খল্‌ হাসিতে ভেসে উঠল তার সামনে, যে জীবনের ছবিতে অনাহার একটা একটানা চৌঘরা রেখার মত বেড় দিয়ে রেখেছে। সেই খল্‌খল্‌ হাসির তাড়ায় আজ আবার এসেছে সে এই চটকল শহরে. ছুটে গেছে ডায়মণ্ডহারবার থেকে তিনসুকিয়া, নোয়াখালি থেকে পশ্চিমের কয়লার খনিতে। মহারুদ্র মন্বন্তরের করাল থাবার ছায়ায় ঢাকা পথে পথে ঘুরে সব হারিয়ে, পঞ্চাশ সালের গলিত জনপদের উপর ঊর্ধ্বশ্বাস প্রেতের মত পদে পদে আটকে যাওয়া পা জোর করে তুলে ছুটেছে সে। তবু আজও বুকের কোন্‌খানটায় ব্যথা ও জ্বালা বোধের একটা ছোট জায়গা রয়ে গেছে, যেখানে পথচলা জীবনের সব ধারা খট্‌ খট্‌ করে বারবার বেঁধে যায়।
হঠাৎ তার কানে এল বাড়িওয়ালার কর্কশ গলার শব্দ, এই-এই নগিনা. খালি থালাটা ঘাঁটছিস্‌ কেন, অ্যাঁ?
নগেন যেন চমকে উঠে বলল, কী বললে?
তোর মাথা।···নে নে, আমি দুটো দিচ্ছি···খেয়ে নে। বলে ঠকাস্‌ করে পাতে কি যেন দিল।
নগেন বলে উঠল তার স্বাভাবিক মোটা গলায়, থাক্‌ না বাড়িওয়ালা।
এহে, কোথাকার জামাই এল। কড়া ধমকের গলায় বাড়িওয়ালা বলে উঠল, লে লে খেয়ে উঠে যা। ব্যাটা জন্মালি, তো এত বড় শরীরটা নিয়ে কেন?
তারপর হেঁকে উঠল, কই হে ফোর টুয়েন্টি, আবার রাস্তা হারালে নাকি?
গোবিন্দের মুখে আবার সেই স্বভাবসিদ্ধ হাসিটি ফুটে উঠল। কাছে এসে বলল, সব যে জেগে আছে।

বাড়িওয়ালা হাসল না কাশল কিছু বোঝা গেল না, কেবল একটা হুংকার শোনা গেল।

বাজিকর কাছে এসে সাহেবী কায়দায় সেলাম ঠুকে বলল, শোন বাবা ফোর টুয়েন্টি, ভাতের ফেনটা রোজ আমার পাওনা। আমার পোষা সাপ তিনটে হুধের চেয়ে ফেনটাই বেশী খায়, বুঝেছ ?

নগেন তার অবশিষ্ট গরাসটা মুখে তুলে বলল, হ্যাঁ, ওর একটা মস্ত হেলে আর একটা বিঘত্‌খানেক ঢ্যাম্‌না সাপ আছে।

সদী বুড়ি বলল কেশো গলায় হেসে, ও আবার ঢ্যামন্‌টাকে দেখিয়ে লোককে বলে ন্যাজ ক্ষয়া তক্ষক।

কথাগুলির উদ্দেশ্য তাদের নতুন বন্ধু গোবিন্দকে শোনানো। কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই কথাগুলো বাজিকরের মনে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। সে হঠাৎ রেগে বলে উঠল, বিষ দাঁতগুলো ঝরিয়ে দিয়েছি, নইলে একবার মজাটা দেখিয়ে ছাড়তুম।

ওই যা হুখুঃ ! বলে নগেন উঠে গেল।

সদী বুড়ি হলেও প্রাণটা তার এদিক থেকে ডাটো রয়ে গেছে। সে বেশ খাপ্‌চি কেটে ধীরে ধীরে বলে, বিষ নেই বলেই তো চক্করঅলা সাপকেও ঢোঁড়া বলে, তাতে রাগের কি আছে! কী বল হে, ফোরটোয়েন্টি না কি তোমার নাম। বলেই সে চাপা গলায় হাসে খলখল করে। গোবিন্দ ভাবে, বাঃ বুড়ি ভারী রসিক তো। তার সেই বহুদিনের আগে গাঁয়ের কথা মনে পড়ে যায়। সে ভাবে, এই আস্তানায় ও আবহাওয়ায় বুড়ির প্রাণটা এমন টাটকা রয়েছে কেমন করে! কিন্তু বাজিকর ক্ষেপে ওঠার আগেই সদী বুড়ি চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাজিকর চেঁচিয়ে কিছু একটা বলার পূর্বেই গোবিন্দ তার হাত ধরে বলল, ছেড়ে দাও ভাই, বুড়ি মানুষ। আমি তো আর অবিশ্বাস করিনি।

বাজিকর একটু সন্দিগ্ধভাবে তাকাল গোবিন্দের দিকে। বলল, ফোর টুয়েন্টি লোক তুমি, তোমার কথায় কিছু বিশ্বাস আছে ? আচ্ছা কালই তোমাকে সাপগুলো দেখিয়ে দেব, তখন বুঝবে।······আর

আমাকে মিথ্যুক বলে লাভ কি? মাদারিখেলা, সেও তো এক ফোর টুয়েন্টি, হ্যাঁ এই তো সাদা কথা। লোকে কি ঘাস খায় যে কিছু বোঝে না!

নিশ্চয়ই। গোবিন্দ তাকে ঠাণ্ডা করতে চাইল।

কিন্তু বাজিকর থামল না।—আর ফোর টুয়েন্টি নয় কে বল? কোন শালা এসে আমার সামনে বলুক চারশ বিশ করেনি, পাঁচজুতি খেয়ে তার আমি মাদারিখেলাই ছেড়ে দেব।

কালো রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, কই গো প্রেমযোগিনী, ভাত নিয়ে যাবি, না-কি? ফুলকি, এই ফুলকি।

বাড়ির ওপাশ থেকে জবাব এল, সে তো বেহুশ। ঠাণ্ডার দিনে খুব টেনেছে।

এ পড়ে আছে।

কালো বলল, খোঁচা দিয়ে তুলে দে তো।

তারপর গোবিন্দকে ডাকল সে খেতে। বাজিকর আবার ফ্যানের কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে বিদায় নিল।

বাড়ির উত্তর দিকটাতে একটা চেঁচামেচি পড়ে গেছে। সানুনাসিক জড়ানো একটি মেয়ে-গলার টেনে টেনে কান্নার মত শব্দটা ভেসে আসছে।

কালো বলে উঠল, এই সেরেছে ছুঁড়ি এখন আবার গান ধরেছে!

গোবিন্দ জিজ্ঞেস করল, কে ও?

প্রেমযোগিনী।

মানে?

মানে কি আর সব কথার আমরাই জানি? কালো বলল বিকৃত মুখে, বলেছি তো তোমাকে, এ চটকল বাজারের মতি গতি ভগবানও জানে না। নাম ওর ফুলকি কিন্তু হয়ে গেছে প্রেমযোগিনী। বলে ও নাকি খুব ভালো আর বড় ঘরের মেয়ে ছিল। পীরিতের মানুষ হারিয়ে অবধি ও পথে পথে ঘুরে শেষটায় মরেছে এই চটকলে। শেষের দিকে কালোর গলার স্বরটা চেপে এল তিক্ততায়।—ছুঁড়ি

মদ খাবে কাড়ি কাড়ি আর সন্ধ্যে হলে রোজ চেঁচিয়ে মরবে।···
··মা বাপ নেই······কোন কিছুর মা বাপ নেই। থাকবে কি করে?
চটকলের কি মা বাপ আছে।

ফুলকির চেয়ে কালোর কথাগুলোই গোবিন্দের মনে লাগে বেশী এবং তার বারবারই মনে হচ্ছিল কথাগুলো কালো বলছে না। ওর ভেতর থেকে আর একজন একটা ক্ষতবিক্ষত গলা থেকে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে।

ফুলকির বেসুরো সরু গলার গান ভেসে এল, আমার কানুমণি মথুরায় গেছে······এবং গেছে বলে সেই বিলম্বিত টান আর থামতে চায় না মনে হয় সেই বিলম্বিত টানের রেশ গান থেকে শেষটায় যেন কান্নায় রূপান্তরিত হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে।

বাড়িওয়ালার গম্ভীর গলা শোনা গেল, ফুলকি!

চট্ করে গান বন্ধ হয়ে গেল এবং দড়াম করে একটা শব্দ হল দরজা বন্ধের।

কালো বলল, নেও হয়ে গেছে। আজ আর ও খাবে না।

কেন?

ওই যে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এরকম হয় ওর পেরাই।

পাগল নাকি? জিজ্ঞেস করল গোবিন্দ।

পাগল নয় কে? এক কথায় যেন সব মীমাংসা করে দিল কালো। ভাত দিল খেতে গোবিন্দকে।

কালোর মায়ের দিকে তাকিয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা পেল না গোবিন্দ।

প্রায় হামা দিয়ে কালোর সঙ্গে একটা খুপ্‌রির মধ্যে ঢুকল গোবিন্দ। ফস্ করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে কালো ধরালো একটা মোটা পাকানো পাটের ফেঁসো। মনে হল যেন দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল ঘরটাতে।

কালো বলল, তোমার বিছানাপত্তর কিছু আছে তো ?
গোবিন্দ বলল, একটা গামছা আছে।
কালো বক্র ঠোঁটে ফিরে তাকাল, ও, তুমি দেখছি আর এক কাঠি ওপরে।
খালি নর্দমার জলে হাত ধুতেই যত গা ঘিন্ ঘিন্ মন্ চেকনাই ?
তা বলে নর্দমার জলে কারো যাওয়া ঠিক নয়।
কেন ?
ব্যামো ট্যামো হতে পারে।
কালো হেসে উঠল এবং বোধ হয় এই প্রথম সে হাসল। হাসিটিও বড় বিচিত্র। ওপর পাটির সামনের দুটি দাঁত নেই, পাশের দাঁত দুটো ছুঁচলো ও লম্বা। তাতে হাসিটা তার খানিক জান্তব হয়ে উঠেছে।
ব্যামো ? নর্দমার জলে হাত না ধুয়ে এখানে তুমি ব্যামো আটকাবে ? বলতে বলতে তার চোখ দুটো যেন কোন বীভৎস দৃশ্য দেখে উদ্দীপ্ত ও বড় হয়ে উঠল।—কোথায় ব্যামো নেই ? এই ঘরে, এর দেওয়ালে, চালে, মেঝেয়, সারা বস্তি, পথ, বাজার ; দুনিয়াময় থিক্ থিক্ করছে ব্যামো। ব্যামো আটকাবে তুমি ?
প্রতিবাদ করলে কালো খেপে উঠতে পারে ভেবে একটু তোয়াজ করে, তার হাত ধরে বলল, মানি ভাই তোমার কথা তবু আটকাতে হবে তো। নইলে মানুষ তো সাবাড় হয়ে যেত কবে।
হবেই তো। কালো যেন ব্যাধিগ্রস্ত বিকারের রোগীর মত বলতে লাগল, মানুষ তো সব সাবাড় হবেই, কে বেঁচে থাকবে ? ব্যামো যে মানুষের মনে !
তাহলেও ব্যামো সারাতে হবে। মানুষ কত কষ্ট করে বাঁচতে চায়, দেখনি তুমি ? গোবিন্দ বলল।
দেখিনি ? পোড়া মাছের খাবি খাওয়া খুব দেখেছি।
গোবিন্দ এবার দৃঢ় গলায় বলল, মনে তোমার যাই থাক, কালো, তুমিও বাঁচতে চাও। না চাও যদি তো খাও কেন, উপোস তো দেও

না। বিষ মিশিয়ে খাওয়াও না কেন সবাইকে রান্নার মধ্যে দিয়ে?
পোড়া মাছ তো মানুষ নয়, তুমি মানুষের কথা বল।
কালো একদৃষ্টে কিছুক্ষণ গোবিন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আর শালা, তুমি আমাকেও ফোর টুয়েন্টি করছ; বোঝাচ্ছ আমাকে? আচ্ছা থাকো দু-দিন চটকল বাজারে, দেখ চোখ ভরে প্রাণের নিশানা—
থেকেছি আমি। দশ বছর আগে আমি এখানে কাজ করে গেছি।
একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে গিয়ে হঠাৎ যেন চুপসে যাওয়ার মত কালো চুপচাপ বসে পড়ল। না, গোবিন্দ দশ বছর আগে এখানে ছিল, সেজন্য নয়। সে মনে মনে বলে উঠল, গোবিন্দ বুঝবে না তার কথা, গোবিন্দ চিনবে না তাকে। একটা ঘাগী ভবঘুরে। সে কি করে বুঝবে তার কথা, যার জীবনে ঘর শুধু বার-বার ভেঙেই গেছে। বাঁচতে চাওয়াটাই কি বাঁচা! মরার মুখে কুটো আঁকড়ানো জীবন সার, তবে বেঁচে থেকে লাভ।
গোবিন্দ তাকিয়ে রইল কালোর দিকে। এই কালোর মত একদিন সেও আশা ছেড়ে দিয়েছিল। পথে পথে ঘুরেছে আর বিদ্রূপ করেছে সব কিছুকে। বিদ্বেষ পোষণ করেছে সবকিছুর উপর আর গালা-গালি দিয়েছে জীবনকে আঁকড়ে ধরে থাকা মানুষগুলিকে। কিন্তু আবার মুখ থুবড়ে পড়েছে এসে সেইখানেই। সে অনেক শান্ত হয়ে গেছে আজ। একটা অদ্ভুত ধৈর্য ও দৃঢ়তা পেয়েছে সে।
আঁকড়ানো জীবন সার, তবে বেঁচে থেকে লাভ!
বুঝল কালো তাকে বিশ্বাস করেনি কিন্তু এও সে বুঝল এ কালো আসল কালো নয়। এর ভেতরে আর এক কালো আছে, যে কালোর আনাগোনা বহু তলায়। যার হদিস সহজে পাওয়া যাবে না। সে কালোর প্রাণে বোধ হয় আছে কোন দগদগে ঘা, যার জ্বালায় নিয়ত সে মৃত্যুর দাপট দেখছে। বিশ্বাস হারিয়ে যাচ্ছে বাঁচার। সে তাকিয়ে দেখল কালোর দিকে। দেখে মনে হয় আধবুড়ো, কিন্তু তত বয়স হয়নি সত্যি কালোর। মাথার চুলগুলো প্রায় সবই পেকে গেছে, শরীরটা যেন পাথরের মত শক্ত। মোটা মোটা হাড় বেরিয়ে পড়েছে

খোঁচা খোঁচা পাহাড়ের গায়ের মত। চোখ দুটোতে তার এত ঘন ভাবের দ্রুত খেলা যে, তাকে চেনা ভারী মুশকিল।

সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা কালো, তোমার আর কে কে আছে?

কেউ না।

সে কি! বাপ মাও নেই?

সে দুটো তো কবেই গেছে।

বে টে করনি?

একবার নয়, দু-বার।

কী হল তাদের?

যা হয়। কেটে পড়েছে।

মানে? মরে গেছে?

মরবে তো তোমাকে আর মানুষের মনের ব্যামোর কথা বলব কেন? আটকুড়ো নই. কয়েকটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল, সবশুদ্ধ শালা গায়েব হয়ে গেছে।

বলতে বলতে দপ্ করে জ্বলে উঠল আবার কালো।—অথচ কী না করেছি? জান কাবার করে দিয়েছি, তবু বাঁচতে চেয়েছি। আমার সে মুখে শালা লাথি মেরে পর পর দুটো চলে গেল।······কামাতে গেল চটকলে, আর এল না।

বলে সে হঠাৎ যেন যাদুকরের মত দাঁড়িয়ে উঠে ফেঁসোর মশালটা হাত দিয়ে চেপে নিভিয়ে দিল। তারপর ধপ করে শুয়ে পড়ল মাদুরের এক কোণে। বলল, শুয়ে পড়।

গোবিন্দকে যেন কেউ মুখের উপর থাবড়া মেরে চুপ করিয়ে দিয়েছে। সে নির্বাক, নিস্পন্দ। তার বারবার ইচ্ছে করছে কালোকে দু-হাতে সাপটে ধরে সন্তানের মত বুকে চেপে রাখে। তার অনেক কথা হুড়মুড় করে ঠেলে আসতে লাগল গলায়। কিন্তু সে-সব কথা হয়তো অর্থহীন উপহাসের মত ঠেকবে এখন কালোর কাছে। কালোর যে প্রাণে সত্যিই আগুন লেগে গেছে! সে আগুনে দিশে-হারা কালো দিগ্বিদিক ছুটে বেড়াচ্ছে আর চারিদিকেই দেখছে মানুষের

চিতা পাতা রয়েছে পথে পথে ঘাটে ঘাটে।
আছে সত্য, কিন্তু গোবিন্দ দেখেছে মানুষ সে চিতা এড়িয়ে এড়িয়ে অন্য পথে চলেছে। কালোর বউয়েরা কি বুঝে শুনে কোন চিতায় পা বাড়িয়েছে, না অন্ধ জীবনের পোড়ানি থেকে,প্রেমহীন খোলা আকাশের সোয়াস্তি চেয়েছিল? কিন্তু কোথায় খোলা আকাশ জীবনের? তাকে যে আড়াল করে রয়েছে বেড়াজালের ঘেরাটোপ!
গোবিন্দের নিজের হারিয়ে-যাওয়া জীবনের ছবি ভেসে উঠতে লাগল অন্ধকারে······মায়ের প্রশস্ত কোল জোড়া মেটে বর্ণের হোঁতকা ছেলে, অমৃতভরাট পূর্ণ স্তন ঠাসা ছেলের মুখে। মায়ের আধবোজা চোখে অপূর্ব রহস্যময় হাসি, হাসি যে নামহীন বিচিত্র স্বপ্নের! এক ফোঁটা আগুনের মত সিঁদুরের টিপ কেঁপে কেঁপে উঠেছে। অদূরে গিন্নির মত আঁট করে চুলের চূড়োবাঁধা ছোট্ট মেয়ে বেঁধেছে খেলাঘর। ······মায়ের সেই অপূর্ব চোখের দৃষ্টি আড়ে আড়ে দেখছে অদূরের পেয়ারাতলার পুরুষের দিকে, করাতের ঘর্ ঘর্ শব্দে যে গোরুর গাড়ির চাকা বানাচ্ছে।
তারপর? এক দুঃস্বপ্নের ঝোড়ো ঝাপটায় সে ছবি গেছে ছিঁড়ে খুঁড়ে। শিশু হোঁতকা ছেলে যেন একটা রাক্ষুসে ময়ালের মত হাঁ করে খেতে চাইছে মায়ের কাছে, চূড়ো বাঁধা মেয়ে খেলাঘর ভুলে টেনে টেনে ছিঁড়েছে মায়ের কাপড়, শূন্য জঠর মা কাঠির মত শরীরটা নিয়ে দাপিয়ে মরেছে উঠোনে। গোরুর গাড়ির ভাঙা চাকায় মুখ দিয়ে পড়ে আছে পুরুষ···
তারপর যেন কোন অদৃশ্য দানবের থাবার ঝাপটায় এক একটাকে টেনে টেনে নিয়ে গেল। কেবল রয়ে গেল পেয়ারাতলার ছুতোর। ···তাদের সেই চলে যাওয়ার সঙ্গে কালোর বউয়েদের চলে যাওয়ার ফারাক কতখানি? দুজন গেছে বেড়াজাল থেকে বেড়াজালেই মুক্তির সন্ধানে আর এদের মেরেছে বেড়াজালের রুদ্ধশ্বাস চাপ।
গোবিন্দ ডাকল, কালো!
কালো জবাব দিল, বল!

গোবিন্দ বলল, মানুষের বড় পোড়ানি। সে পোড়ানিতে সব আঘাটে মাঘাটে জল খোঁজে। যদি ঘোলা জলে গিয়ে পড়ে, তাকে দোষ দিও না।

কালো জবাব দিল না। দুজনেই তারা চুপ করে পড়ে রইল।

বাইরে কোথায় খট করে একটা দরজা খোলার এবং বন্ধ করে দেওয়ার শব্দ হল।

কালো বলে উঠল, ওই শোন লোটন বউ দরজা খুলে সে দুটোকে ঘরে নিয়ে গেল। এর পর শোনা যাবে ফুলকির গালাগাল।

কেন ?

ও এক প্রেমযোগিনী, আবার ওর প্রেমে যে হাবুডুবু খাচ্ছে অনেকে। তারা গিয়ে দরজায় টোকা মারবে।

তারা কারা ?

এ বাড়িরই লোক।

তা, ফুলকি দরজা খোলে না ?

তবে আর তোমাকে বলছি কি। সব তো মনের ব্যামো। এদিকে রাতদিন প্রেমের কথা, কিন্তু কে যে ওর পীরিতের লোক, তা ভগবানই জানে। বেওয়ারিশ ছুঁড়ি······মর্জিতে চলে। খাবে কোন্ দিন শকুনেরা ছিঁড়ে। একে বলে চটকল বাজার।

পরদিন গোবিন্দের ঘুম ভাঙল শ্বাস টান লেগে। নিশ্বাস না নিতে পেরে সে ধড়ফড়িয়ে উঠল। কিন্তু সব অন্ধকার। পাশে হাতিয়ে দেখল কালো নেই। একটা সামান্য আলো দেখা যাচ্ছে দরজার দিকে। সে তাড়াতাড়ি সেদিকে ছুটে গেল।

বাইরে এসে ও দেখল সব ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। হঠাৎ এত ধোঁয়া এল কোত্থেকে সে ভাল করে তাকিয়ে দেখল, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন সমস্ত ঘরগুলো থেকেই প্রায় ধোঁয়া বেরুচ্ছে, উনুনে আগুন দিয়েছে সব। আকাশটা পর্যন্ত দেখা যায় না। হাওয়া নেই। চারিদিকে কেবল

ধোঁয়া, ধোঁয়ার গায়ে যেন আঠা মেখে দিয়েছে, তার নড়বার উপায় নেই। সমস্ত জগৎটা যেন ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে। মনে হয় যেন জমাট কুয়াশায় ঠাসা চারিদিক। ছেলেবেলায় একবার গোবিন্দ শুনেছিল, নরকটা নাকি ধোঁয়ায় ভরা। পাপীদের শাস্তির জন্য সেখান থেকে স্বর্গ দেখা যায় না আর সেই ধোঁয়া থেকে আচমকা এক একটা বিদ্ঘুটে প্রেত হাঁ হাঁ করে এগিয়ে আসে। এ যেন সেরকম হঠাৎ কারো মুখ দেখা যাচ্ছে, কিংবা কেউ হুস্ করে ধোঁয়ার ঝাপটা দিয়ে চলে যাচ্ছে পাশ দিয়ে।

গোবিন্দ লক্ষ্য করে দেখল, আস্তে আস্তে পেটভরা ময়ালের মত ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে সরছে। বুঝি হাওয়া লেগেছে। সে বুক ভরে একটা নিশ্বাস নিতে চেষ্টা করল· ····এই ধোঁয়া ঠেলে উঠবে আকাশের চাপ বাঁধা মেঘ সরিয়ে, তারপর আবার সে ধোঁয়াকে তাড়া করে নিয়ে যাবে দক্ষিণ বাতাস।

হঠাৎ বাড়িওয়ালার ক্রুদ্ধ গর্জন শুনল সে, বেবো, পুট্কে খচ্চরের দল।

অমনি উঠোনের এধার ওধার থেকে একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হুড়দাড় করে ছুটে যেতে লাগল বাইরে যাওয়ার গলিটার দিকে। কেউ ন্যাংটো, কেউ ইজেরটা কোমরের কাছে ধরে কিংবা পাছা থেকে জামা গুটিয়ে।

একটা মেয়ে গলার খিল খিল হাসি শোনা গেল।

বাড়িওয়ালা আবার চিৎকার করে উঠল, যার যার বাচ্চারা টাট্টি করেছে, তারা সব উঠোন সাফ করে দেও।

বলে সে বেরিয়ে গেল।

গোবিন্দও গেল তার পিছন বাইরে। বাইরে এসে দেখল দোতলা বাড়িটার ছাদ থেকে দুটো ছেলে বেধরক ঢিল ছুঁড়ছে পেছনের নর্দমাটার দিকে!

গোবিন্দ সেদিকে গিয়ে দেখল ছেলেমেয়েগুলি ন্যাংটো হয়ে নর্দমায় বসেছিলো ঢিলের তাড়া খেয়ে আবার ছুটেছে সড়কের দিকে।

সড়কের উপর যমদূতের মত দাঁড়িয়েছিল মেথর একটা। সে হেঁকে উঠল, খবরদার, রাস্তায় বসলেই ঠ্যাঙাব।
কিন্তু শিশুদের দেহের ভিতরের সে বেগ আর আটকে রাখার উপায় ছিল না, তারা সমস্ত কিছু অগ্রাহ্য করে বসে পড়ল রাস্তার ধারে ধারে।
মেথরটা একে তাড়া করে তো আর একটাকে পারে না। এমনি করেই বাচ্চাগুলোর প্রাতঃকৃত্য শেষ হয়। তখন কারো ঠ্যাঙে কারো পায়ে লেগে থাকে বিষ্ঠা। আবার ছোটে জলের সন্ধানে। ঠিক এ সময়েই চটকলের ও অন্যান্য কারখানার বাঁশী ভোঁ গোঁ গোঁ করে চীৎকার করে ওঠে।
কাণ্ড দেখে গোবিন্দের যেন দম আটকে এল। দেখল, তার পাশে দাঁড়িয়ে বাড়িওয়ালাও ভ্রূ কুঁচকে সে দৃশ্য দেখছে আর আনমনে গোঁফ টানছে জোরে জোরে।
গোবিন্দ বলে ফেলল, একটা পায়খানা নেই?
ভ্রূ জোড়া করে খানিক কুঁচকে বলল, হ্যাঁ, আশমান থেকে পড়বে।
কেন, বানানো যায় না?
কী করে?
এই ইট দিয়ে, জনমজুর খাটিয়ে।
তোমার কাছ থেকে তা শিখতে হবে? প্রায় ধমকে উঠল বাড়িওয়ালা।—মিসিপাল্‌টির হুকুমটা কে দেবে অ্যাঁ? তুমি?
ও! সে কথাটা গোবিন্দ ভুলেই গিয়েছিল।—দেয় না কেন?
কেন দেবে? অফ্‌সরের ঘুষের টাকা না দিলে? বলি ঠিকা জমিতে মিসিপাল্‌টির মেথর খাটবে না। বলতে বলতে সে রকের উপর তার সে খাটিয়াতে বসে আপন মনেই বক্ বক্ করতে লাগল, আর আমি যদি শালা মানুষের বাচ্চা হই, এক আধেলাও ছাড়ব না। আর পায়খানা আমি করবই, জলকলও আনবই, দেখি কে আমাকে রোখে। বলে ভ্রূর তলা থেকে একবার চকিতে গোবিন্দকে দেখে হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে ডাকল। গোবিন্দ কাছে এলে দেখা গেল তার

ভ্রূ দুটো উঠে গিয়ে বিচিত্র দুটো স্বপ্নভরা চোখ বেরিয়ে পড়েছে। মুখের সমস্ত কোঁচগুলো কোথায় পালিয়ে গিয়ে একটি শান্ত মুখ বেরিয়ে পড়ল হঠাৎ। এদিক ওদিক দেখে সে বিস্মিত গোবিন্দকে আরও কাছে ডেকে ফিসফিস করে বলল, এটা আমি পাকা বাড়ি করব, ইটের গাঁথনি আর ছাদ দিয়ে। হাঁ তার আগেই জলকল আর পায়খানা আমি করে ফেলব, কী রকম হবে?

বলেই একটু হেসে ফেলে আবার বলল, এই এদেরই আমি রাখব, যারা এখনও আছে। আমি তো ছিঁচকে চোর বাড়িওয়ালা নই, বিরিজমোহনও নই, সেজন্য আমার সঙ্গে কারও বনে না। তা এরা এসব বোঝে না। রাম! রাম! ভাড়ার টাকাটাও ঠিকমত কেউ দেয় না। কিন্তু বস্তি নাম আমি ঘোচাবই—হাঁ।

আচমকা কাছেই কোত্থেকে সদীর গলা শোনা গেল, সে কথা তো বিশ বছর ধরে শুনে আসছি, হয় না তো।

একেবারে এক কড়া গরম দুধে এক ফোঁটা লেবুর রস পড়ে ছানার মত কুঁকড়ে দলা পাকিয়ে গেল বাড়িওয়ালার মুখটা। তীব্র দৃষ্টিতে একবার দেখে নিল গোবিন্দের মুখে কোন ভাবান্তর ঘটছে কিনা। ফুঁসে উঠে বলল, এবার দেখ, দেখ ও আমাকে কোনদিন পুরো ভাড়া দেয় না। আবার আমাকে বিশ বছরের কথা শোনাচ্ছে! একদিন ধরব, এক একটাকে, আর গলা ধাক্কা দিয়ে বের করব। ঠিক দেখে নিও।

গোবিন্দ এতক্ষণ প্রায় ভ্যাবাচাকা খেয়েছিল। সে সত্যি কল্পনা করবার চেষ্টা করছিল যেন, এ বস্তিটা নেই, একটা সুদীর্ঘ এক-তলা বাড়ি উঠেছে, হলদে তার রং। পায়খানার ছাদটা দেখা যাচ্ছে, ছর ছর করে জল পড়ছে ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার মেঝে। সামনে মাঠ—নয়া সড়ক হয়ে গেছে পিচের রাস্তা।

সদী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, তা তোমার ঠিকে জমির উপর ছাদওয়ালা বাড়ি বানাতে দেবে কেন! পায়খানার হুকুমই বা মিলবে কী করে?

বাড়িওয়ালা বলল মুখ ভেংচে, ঠিকে বুঝি মৌরস করা যায় না?
তেমনি গলায় বলল সদী, হ্যাঁ, যাদু মন্তরে মৌরস হবে। আগের জমিদারের আমলে তো হয়েছিল মৌরস। নতুন মালিক তো আবার ঠিকে বানিয়ে দিলে। কী করলে তুমি?
হঠাৎ কোন জবাব না আসাতে বাড়িওয়ালা নিজের উপরেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল কি সদীর পরেই রেগে গেল বোঝা গেল না। চেঁচিয়ে উঠল, আমি টাকা দিয়ে মৌরস করাব, টাকা দিয়ে, বুঝেছ?
সদী একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, তোমার গাছ আছে টাকার। যখ্ দিয়ে রেখেছ যে!
গোবিন্দ কি একটা বলতে চাইল। তার আগেই বাড়িওয়ালা খেঁকিয়ে উঠল, টাকা কি আমার কোনদিন হবে না? কোথাকার উল্লুক মেয়েমানুষ!
সদী নির্বিকারভাবে ঠোঁট উলটে বলল, সে তোমার মত বাড়ি-ওয়ালাকে দিয়ে হবে না।
চোপ্, চোপ্‌রাও। বলে ধমকে উঠল বাড়িওয়ালা। হয় কি না হয়, দেখিয়ে দেব। তুই তোর ভাড়াটা মিটিয়ে দিস্।......শালা কারো সঙ্গে আর মহব্বত রাখব না!
বলে উঠে বাড়ির ভিতর চলে গেল। সেখানে আবার কিসের একটা গোলমাল চলছে।
সদী বুড়ি চোখ মটকে হেসে বলল গোবিন্দকে, একটা পাগল!
গোবিন্দ খানিকটা বোকার মত বলল, পাগল?
সদীর রেখাবহুল মুখটা কুঁচকে যেন ছোট হয়ে গেল। একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, তাছাড়া আর কী বলব? এ সংসারে ওর মত মানুষ কেন জন্মায়, তাই ভাবি।......ওর ওই অসুরের মত শরীরটা দেখলে লোকে ভয় পায়। আমি দেখি, ও একটা ছ-মাসের বাচ্চা, হ্যাঁ... ।
বলতে বলতে সদী কেমন অস্বস্তিতে ছটফটিয়ে ওঠে। তার কুঞ্চিত চামড়ায় ঢাকা চোখ দুটো বড় করে, মাটিতে দাগ কষে বলল, কেন? না, ওর মাথাটা গোবরে ঠাসা। নইলে ভাবো এ বস্তির ভাগাড়কে

কিনা ও সগ্গ বানাতে চায়, বলে পাকা বাড়ি তুলবে। আরে আজ বাদে কাল তোকে কোথায় উঠে যেতে হবে, বিরিজামোহনের মত হারামজাদা বস্তি মালিকরা রাতদিন তোর সর্ব্বোনাশের সিঁদ খুঁড়ছে আর ও মেতে আছে ওর নেশায়। কি? না, আমি সবাইকে ভালো রাখব, পালন করব রাজার মত।

রাজার মত? গোবিন্দ প্রায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল।

গলার ভেতরে একটা অদ্ভুত শব্দ করে বলল সদী, তবে আর তোমাকে বলছি কি। সে পাগলামি তো শোননি। ও যে নিজেকে রাজা ঠাউরে বসে আছে।

বলে সদী বুড়ি হঠাৎ চুপ হয়ে গিয়ে পশ্চিমের মেঘভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর তার বুড়োটে গলায় বলতে আরম্ভ করল, কে ভেবেছিল ও আবার এত বড়টা একদিন হবে, বিদেশে এসে বাড়িওয়ালা সেজে বসবে!···গাঁয়ে ওকে সেদিন জন্মাতে দেখলুম। এ্যাই সেদিনের কথা, পাটোয়ারী দিনে দুকুরে ওদের ঘর জ্বালিয়ে দিল, খুন হয়ে গেল ওর বাপটা। কার বা কানুন, কে বা বিচার করে!···ওর মা খাপসুরত জোয়ান অওরত, ওকে কোলে করে ভেগে গেল একটা সাধুর আড্ডায়। ভগমানের ডেরা। এ তো তখন দু-এক বছুরে বাচ্চা।······বলে সদী বুড়ি হেসে উঠল, না তীব্র বিদ্রূপে হু হু করে উঠল বোঝা গেল না। গোবিন্দের দিকে ফিরে বলল, সে ভগমানের ডেরায় গিয়ে ওর মা বছরে বছরে একটা করে মরা বাচ্চা বিয়োতে শুরু করলে। গাঁয়ের নজ্‌দিক তো, আমরা দেখতে যেতুম। জানের ভয়ে বেচারা মুখ খুলতে পারত না।···তারপর দশ বছর বাদে মাগী মরে গেল। সে মড়াটা তো আর সাধুরা ছুঁতে পারে না, ডোম দিয়ে ভাসিয়ে দিলে জাহ্‌নবীর কোলে। জাহ্‌নবী?···

সদীর গলা মিলিয়ে গেল হাওয়ায়। এক চিমটি রোদ উঁকি মেরেছে মেঘের ফাঁকে। সে আলোয় হঠাৎ নেমে আসা ইলশেগুঁড়ির ছাট যেন অজস্র মুক্তোকণার মত ঝিকমিকিয়ে উঠল। বি, টি, রোডের

সারবন্দী কারখানা থেকে ভেসে আসছে যন্ত্রের ও বয়লারের মূর্ছাহত গোঙানির শব্দ।

সদী উত্তেজিত গলায় ফিসফিসিয়ে উঠল, মা মরল তো কি হল কম্‌লি যে ছোড়তা নহি। ওর মার ব্যাপারটা সাধুরা ছেলেকে দিয়ে পুষিয়ে নিতে লাগল। তখন ও বেশ নাদুস নুদুস ছেলেটি। ওকে সাধুরা……

গোবিন্দের বিস্মিত কৌতূহল ভরা চোখ ও থ-মারা মুখের দিকে তাকিয়ে বন্ধ হয়ে গেল সদীর গলা। আপন মনে মাথা নেড়ে সে কি সব বিড় বিড় করতে লাগল। কুঞ্চিত গালের ভাঁজে ভাঁজে নেমে এল জলের ধারা।—বেচারা অবুঝ বাচ্চা…যেন সীতার লব কুশের একটা! মনে মনে মহাদেওকে ডেকে বলতুম, হে দেওতা এ সন্‌সারের হর্ আদ্‌মির যৌবন তুই খাক্ করে দে! থু থু…মানুষ এত বড় জানোয়ারও হয়।

গোবিন্দ উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কী হল?

কী আর হবে। ওকে কয়েদীর মত সাধুরা রেখে দিল, কারো বাত-পুছ করতে দিত না।…তারপর, ও নিজেই একদিন কোথ পালিয়ে গেল, তা আমরাও জানতুম না।…বহৎ দিন বাদ বাঙলা এলুম। হাওড়া বজ্‌বজ্ ঘুরে এখানে এসে দেখা মিলল। দেখি বাড়িওয়ালা বনে গেছে। আমাদের পেয়ে খুব খুশি। খুশি হলে হবে, আমি খুশি হইনি। কেন? না ওর পাগলামি দেখে। বাড়িওয়ালা নেই যে ওর দুশমন্ নয়, ওর নতুন জমিদার ওকে কা করবার তালে আছে। সবে এসেছে, এখন দেখবে একা বিরিজামোহন ওকে পাগল করে দিতে পারে। ও যে একেবারে বোকা…বোকা ও যদি বাড়িওয়ালার মত বাড়িওয়ালা হত!…পাগল! এ ঠি জমি আর কদ্দিন! ওকে আবার ভাসতে হবে…।

গলাটা বন্ধ হয়ে এল সদীর।

কিন্তু গোবিন্দের চোখের উপর কেবল বাড়িওয়ালার সেই শান্ত স্বপ্নভরা মুখটা ভেসে উঠেছিল। পাগল, কিন্তু একি দুরন্ত পাগলা

একি অদ্ভুত বাসনা মানুষটার মনে !
বাড়ির মধ্যে গণ্ডগোল শোনা গেল। তারা দুজনেই ভিতরে এসে দেখল, সব মেয়েমানুষই প্রায় মারমুখো হয়ে পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়েছে। কারণ, উঠোনের বিষ্ঠা কে পরিষ্কার করবে, তাই হল সমস্যা। কার বাচ্চা এখানে মলমূত্র ত্যাগ করেছে, কে বলতে পারে ? বাচ্চাগুলোকে জিজ্ঞেস করতেই তারা একযোগে কলের পুতুলের মত ব'লে ওঠে তারা কেউই নয়।
তারা মায়ের মন চেনে, সুতরাং স্বীকার পাওয়া অসম্ভব। যেন উঠোনটা তাহলে নোংরা করেছে ভূতে !
কিন্তু বাড়িওয়ালা সে সব প্রমাণের ধার দিয়েও গেল না। সে হঠাৎ বউগুলোকে ঠেলে ঠেলে দিতে লাগল আর চেঁচাতে লাগল, ব জেনানাকে সাফা করতে হবে, কোন বাত-পুছের দরকার নেই। লাও, চালাও।
ও দৈনন্দিন ব্যাপার। মেয়েরা সব চিৎকারে কান্নায় গালাগালিতে াকাশ ফাটাতে ফাটাতে উঠোন পরিষ্কার করতে লাগল আর ত্যেকেই তার নামহীন শত্রুকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল, সে দি অপরের বাচ্চার ময়লা সাফ করে থাকে, তবে যেন সে বাচ্চা াজই পিশাচের মুখে যায় ; এবং পরিষ্কার হওয়ার পরই শুরু হয় চ্চাগুলোর উপর পীড়ন ও মারধোর।
শুদের চীৎকার আর মায়েদের গালাগালিতে একটা প্রচণ্ড হুলুস্থুল রু হয়ে গেল।
ড়িওয়ালা একমুহূর্ত তা দেখে গোবিন্দকে বলল, দেখ একবার াগুটা। আর আমি এদের জন্যে পাকাবাড়ি বানাতে চাইছি।
ারপর গলার স্বরটা পরিবর্তন করে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, তখন ার বোধ হয় এসব হবে না—ঠিক বন্ধ হয়ে যাবে। কী বল তুমি ? র্বাক গোবিন্দ বাড়িওয়ালার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।
ড়িওয়ালা চলে গেল বিকৃতমুখে বিড়বিড় করতে করতে। একি কটা আস্তো পাগল না, মূর্তিমান শয়তান !

গোবিন্দের হঠাৎ নজর পড়ল লোটন বউয়ের উপর। লোটন বউ হাসছে তার সেই মোটা মোটা ঠোঁট বিস্ফারিত করে। বুকের পাটা ফুলিয়ে বাচ্চাদের ক্ষিপ্ত মায়েদের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু চোখে তার কোনও ভাব নেই। যেটা আছে সেটা ভাব নয়, নিষ্পলক একজোড়া চোখ কাঁচের মত ছায়ালীন, শুধুমাত্র দেখবার জন্যই। বিচিত্র আনন্দ লোটন বউয়ের। এদের এ জ্বালা যন্ত্রণায় তার এত খুশির কী আছে! তাকে উঠোন পরিষ্কার করতে হয় না, তাই কি?

গোবিন্দের সারা গায়ের মধ্যে রি রি করে উঠল লোটন বউয়ের হাসি দেখে।

লোটন বউয়ের হঠাৎ নজরে পড়ল গোবিন্দকে। চকিতে হাসি মিলিয়ে গিয়ে সেই অপলক দৃষ্টি পুরুষের দিকে তাকাল। কালকের গণ্ডগোলে গোবিন্দকে সে দেখেনি। তার তালগাছের মত শরীরটাকে সে স্বভাবসিদ্ধ একটা দোলানি দিয়ে এক পা পেছিয়ে ঠোঁট উলটে বলল, ও মা এটা আবার কে রে?

গোবিন্দ চকিতে তার সেই স্বাভাবিক হাসিটি নিয়ে বলল, গোবিন্দ শর্মা, তোমাদের নতুন মানুষ।

এলাকার পরিবেশ ব্যতিক্রম আশ্চর্য রকম ফর্সা ও পাতলা শাড়ীটা গায়ের সঙ্গে আরও ভালো করে লেপটে, নাক কুঁচকে লোটন বউ প্রায় খিঁচিয়ে উঠল, ওমা! কে ওর নাম জিজ্ঞেস করছে। সরে যাক না এখান থেকে।

তা যাচ্ছি লোটন ঠাকরুন। বেশ ভয়ে ভয়ে বলল গোবিন্দ, আমি তোমার দেওর হই কিন্তু, বুঝলে ঠাকরুন!

আ মলো যা! মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল লোটন বউ, ওসব কথা যেসব মেয়েমানুষে ভালবাসে মিনসে তাদের কাছে যাক না।

গোবিন্দ বলল হেসে, হেঁ হেঁ, বউদিকে কেউ খারাপ কথা বলে? নন্দ-

হরিশ যে আমার দোস্ত্ হয়।

তাই! আরও খানিকটা বিষ দিয়ে বলল লোটন বউ, ওই কমিনা কুত্তা দুটোর দোস্ত্ বলে এরকম বেহায়া।

এবার গোবিন্দ স্তব্ধ হয়ে গেল। লোটন বউ যাদের খায়, যাদের পরে, তাদেরই এমন ঘৃণা করে। ভালবাসার কথা না হয় বাদই গেল। সামান্য করুণা থাকলেও কেমন করে সে সেই কমিনা কুকুর দুটোর সঙ্গে ঘর করে! অথচ যাদের সে কুকুর বলে, তাদের উপর দাপট খানিক তারই আছে, তারা তো ওই পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেই বসে আছে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মনে হল, লোটন বউয়ের জীবন ধারণের ভাবনাই হয়তো বড়। সেই তাগিদেই হয়তো সে একরকম ঘৃণ্য জীবন বেছে নিয়েছে।

নন্দ-হরিশকে সে মারুক ধরুক, লড়িয়ে দিক পরস্পরের মধ্যে, ঘৃণা করুক, তবু হয়তো তাকে বাধ্য হয়েই এঘরে থাকতে হয়। বেশ্যারা কি কখনো তাদের হাজারো অতিথিদের কাউকে ভালবাসে! পয়সা দিয়ে যারা ধরিত্রীর অনির্বচনীয় সুধাকে পান করতে যায়; হাজার হোক পয়সার যুগ, ধরিত্রী কি সেখানে সুধাভাণ্ডের প্রলেপ দিয়ে দিয়ে বিষভাণ্ডই তুলে ধরে না! তারাও কি লোটন বউয়ের মত মনে মনে তাদের কমিনা কুকুর বলে ক্লেদাক্ত ভার বহন করে না! নিরন্তর প্রেমহীন জীবন, তাই তো সবচেয়ে বড় অভিশাপ।

লোটন বউয়েরও কি তাই? আবার ভাবল গোবিন্দ, কি জানি হয়তো যে কথা তার গালাগাল মনে হল, সে কথাই নন্দ-হরিশের কাছে সোহাগের সুরঝংকার হয়তো।

এইসব ভাবতে ভাবতেই সে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল। কলকারখানার লোকজনেরা সকলেই বেড়িয়ে গেছে। মেয়েরা কেউ বেরুচ্ছে ঝুড়ি মাথায় বগলে করে কয়লা আর গোবর কুড়াতে। বেশীর ভাগই ছোট মেয়ে, ছোট ছেলের দলও আছে তার মধ্যে। রান্নাও শুরু হয়েছে কোন কোন ঘরে। ধোঁয়ার সেই আঁকড়ে-ধরা ঘন ভাবটা

অনেকখানি কেটে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে এসেছে।

ছ্যাকড়া মেঘের ভিড় আকাশে। বৃষ্টি নেই, মেঘলা ভাঙা রোদ ছায়ার ধারে ধারে উঠছে হেসে।

গোবিন্দের চোখে পড়ল কালো কি যেন এক হাতে নিয়ে আর এক হাতের আড়াল করে, দ্রুত একটা ঘরে ঢুকে পড়ল। অবাক হল গোবিন্দ, ভারি কৌতূহল হল তার। কালোর আবার কিসের এত লুকোচুরী। এক পা এক পা করে সে কালো যে ঘরে ঢুকেছে, সেই ঘরের দিকে গেল। কাছে এসেই কালোর গলা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সে শুনল কালো ডাকছে, ফুলকি, এই ফুলকি, ওঠ্ ওঠ্ জলদি।

ফুলকির ঘুমন্ত গলা শোনা গেল, কী বলছ।

কলে যাবিনি? কলে বাঁশী বেজে গেছে যে।

বিরক্ত ফুলকির গলা ভেসে এল, আ মলো! তাতে তোমার কি? ভাগো, ভাগো।...

মুহূর্ত চুপ চাপ। আবার কালোর খানিকটা খুশি মাখানো হুতোশের গলা শোনা গেল—খাবিনি? তোর ভাত কাউকে দিইনি ছ্যাখ; রেখে দিয়েছি মাইরি! খেয়ে নে।

ফুলকির ঘুমন্ত গলা সতেজ হয়ে উঠল, মাইরি! তার উঠে বসার শব্দ শোনা গেল কাপড়ের খস্ খস্ ও চুড়ীর বাজনায়। গোবিন্দ কৌতূহল না চাপতে পেরে একটা ছোট্ট ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে দেখল।...আধো অন্ধকার ঘরটিতে আগুনের নীল শিখার মত শ্যামা ফুলকি, ঘুমের জড়তা নিয়েও একখণ্ড ইস্পাতের মত জ্বল জ্বল করছে। শক্ত পুষ্ট বন্য ঢেউ তোলা শরীর। বিস্রস্ত বেশবাস। জামার বোতাম খুলে গিয়ে বুকের বঙ্কিম রেখা উঁকি মেরে আছে। কপালের টিপটা গেছে খানিক বেঁকে, রুক্ষ চুল এলোমেলো হয়ে পড়েছে ছড়িয়ে। কোন রকমে উঠে বসে কালোর দেওয়া ভাতগুলো গিলছে গপ্ গপ্ করে। মুখের ভাত না গিলেই বলছে, উঃ কী খিদেটাই পেয়েছিল।

কালো যেন দেবীদর্শনের মত হাঁটু গেড়ে তার কাছে বসেছে এবং অদ্ভুত করুণায় বেদনায় ও আনন্দে মগ্ন হয়ে চেয়ে আছে ফুলকির দিকে। বলল, কেন খেয়ে নিস্ না সন্ধ্যেবেলা। কত বারণ করি, তবু রোজ সরাপ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে থাকবি।

সে কথা ছাড়। কালোর দিকে না তাকিয়েই ফুলকি বলল, একটু জল দেওতো।

কালো তাড়াতাড়ি উঠে গেলাস না পেয়ে কলসীটাই নিয়ে এল। বিনা বাক্যে ফুলকি হাঁ করল, কালো একটু একটু করে জল ঢেলে দিতে লাগল তার মুখে। মদমত্ততার রাতভর পিপাসা আর মিটতে চায় না ফুলকির। ফুলকির সঙ্গে কালোও ঢোক গিলছে। যেন সেও জল পান করছে। জল গলায় বুকে বেয়ে পড়ল ফুলকির।

পিপাসা মিটলে চোখ বুজে একটা আরামের শব্দ করে উঠল ফুলকি, আঃ! বাঁচলাম!

কালো কলসীটা রেখে উঠল, বাঁচলি না ছাই। তোর মরণ কেউ কি আটকাতে পারবে?

তা এমনি করেই না হয় মরেই গেলাম, আরাম করে তো মরব। বলে হেসে ফেলে ফুলকি।

কালো অপলক চোখে আবেগ নিয়ে তাকিয়ে রইল।

ফুলকি ঠোঁট টিপে চোখ পাকিয়ে বলল, আবার তুমি ওরকম পাগলের মত তাকিয়ে আছ?

দেখি তোকে, ভাবি কেন তোর মরতে প্রাণ চায় ফুলকি?

মরণে যে সুখ আছে।

কি সে মরণ?

ফুলকি ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে বলল, তুমি তো সেরকম ক-বারই মরেছ। ব্যাকুল গলাটা বুঝি কালোর কেঁপে উঠল। বলল, তবে আবার মরব। ফুলকি খিলখিল করে হেসে উঠল, ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেন তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল তার শরীর। বলল, এই মরেছে! তোমার খালি পাগলামি! যাও বাপু, আমি তাড়াতাড়ি কলে ছুটি, সায়েব সর্দার দুটোকে আবার

ভুজুং ভাজুং দিয়ে টাইমে নামটা লেখাতে হবে।

কালো বলল, নতুন রাঁধিয়ে এসেছে, তার চোখ ফাঁকি দিয়ে কি আর খাবার আনতে পারব ?

না পার, রেখে দেবে।

উপোস থাকবি ! কালো বলল।—এসব ছাড় না কেন ?

ফুলকি আবার হেসে উঠল, তোমার খালি এক কথা।

আর না শুনে গোবিন্দ তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। তার সারা মুখে ব্যথা ও হাসির বিচিত্র খেলা। কালো না কাল মরতে চেয়েছিল ? সে কি এই মরণ ! কালোর সেই বুক থেকেই কি ওই আবেগের থর থর ধ্বনি হাহাকার করে উঠেছে যে বুক পুড়ে পুড়ে তার ছাই হয়ে গেছে !

এই কালোই না পোড়া মাছের খাবি খাওয়া দেখে উপহাস করেছে মানুষের বাঁচার তাগিদকে ! হায় ! দু দু-বারের দাগা খাওয়া প্রাণে তার আবার পোড়ানি। না, এ সংসারে মানুষের পোড়ানির শেষ নেই। পোড়া সংসার যে !

বেলা বাড়ছে ধীরে ধীরে। আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে আসছে সমস্ত বস্তিটা।

গতকাল রাত্রের সেই গুরুগম্ভীর বেসুরো গলায় আবার শোনা গেল—

মন আমার নির্বাণ নগরে যদি যাবে—

একটি মাথা-চাঁছা রোগা টিং টিঙে ছেলে বসেছিল একটা ঘরের সামনে আকাশের দিকে চেয়ে। শরীরটাতে তার কিছু নেই। মনে হচ্ছিল বসে বসে বুঝি ঢুলছে। কিন্তু সেই গুরুগম্ভীর গলায় গান শুনেই সে ভেংচে উঠল ওই বুড়োটে গানটা অনুকরণ করে—মন আমার নির্বাণ নগরে যদি যাবে।······

সেই গুরুগম্ভীর গলায় আবার শোনা গেল,

এক স্বপ্নের অলংকার, গঠন বিবিধাকার······

পুনবারে গেলে দেখ যেই স্বপ্নো সেই হবে······

ছেলেটা তার ওই রোগা দেহ থেকে অস্বাভাবিক জোরে চিলের মত শব্দ করে মুখ বেঁকিয়ে উচ্চারণ করে ভেংচাতে লাগল। তাতে সেই গান থেমে গেল না।

ছেলেটার মা এক মধ্যবয়সী মেয়েমানুষ, আরও দুটো বাচ্চাকে নিয়ে বেসামাল হয়ে পড়েছে।···এখানে এ খোলার চালায় অন্ধযুগের আদিম মায়ের মত মেয়েমানুষটি। তার লজ্জার কোন বালাই নেই। একটিমাত্র নেংটি পরনে, বাদবাকি সমস্তটাই খোলা। তার নড়াচড়ার তালে তালে নত বুক দুলছে কিন্তু কোন অস্বস্তি নেই। লজ্জার কথা ভাবাই দুষ্কর। রোগা নয়, কিন্তু শরীরটা যে ফোঁপরা, তা তার ভাবভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে। মানুষের গলায় মাদুলি থাকে। তাব জট বাঁধা চুলে সেই মান্ধাতা আমলের বাঁধা বেণীতে একটা তামার মাদুলি ঝুলছে। মুখখানি নিতান্ত ভালো মানুষের মত সরল, চোখ দুটো যেন আলগা করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অত্যন্ত করুণ ও মিষ্টি গলায় সে তার ছেলেকে বলল, থাম্ বাবা চেঁচাসনি অমন। নাড়ি ছিড়ে যাবে যে?

সে কথায় ছেলেটা যেন আরও দুর্বার হয়ে উঠল। হ্যাঁ চেঁচাব। বলে সে আরও জোরে চেঁচাতে লাগল। তার রুগ্ন মুখটা রক্তহীন নীল শিরায় ছেয়ে গেল। মনে হল গলার শিরাগুলো ছিঁড়ে যাবে এক্ষুনি। মা অন্য দুটোকে রেখে রোগাটাকে বুকের কাছে নিয়ে আরও নরম, আরও অসহায় স্নেহঝরা চোখে বলল, চেঁচালে যে মরে যাবি? শরীলে কী বা আছে তোর?

না থাক। বলে ছেলেটা ধাক্কা দিয়ে খামচে, লাথি দিয়ে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল আর বলতে লাগল, গায় কেন ও শালা, কেন গায়? আমার ভালো লাগে না বলছি।···

মা তার সেই মারগুলো অবিকৃত শান্তভাবেই গ্রহণ করলে বুকের আরও কাছে টেনে নিয়ে বলল, গাক, ওর খুশি হয়েছে তাই গাইছে। তোর ভালো না লাগলে ওর কি আসে যায়।

তারপর তার সেই একঘেয়ে তরঙ্গহীন গলার স্বরে বলল, তুই না বড়

হয়ে কী করবি বলছিলি ?

সে কথায় ছেলেটা হঠাৎ রাগ ভুলে মুখভরা হাসি নিয়ে উৎসাহী হয়ে উঠল। বলল, মাকি সায়েবের সঙ্গে বিলেতে যাব।

তারপর ?

খুব বড় মিস্তিরি হয়ে ফিরে আসব। স্বপ্নাচ্ছন্ন গলায় যেন বলল ছেলেটা।

মা বলল, আর ?

বিচিত্র লজ্জায় মায়ের খোলা বুকে মুখ ঢেকে আধো জড়ানো গলায় বলল, মেমসায়েব বিয়ে করব।

গাইগোরুর দাঁত বেরুলেও তার যেমন কোন ভাব বোঝা যায় না, মায়ের হাসিটিও প্রায় তাই। বলল, আমরা ? তোর ভাই বোনেরা ?

ওরাও থাকবে আমার কাছে।

তাতে তোর মেমসাহেব যদি রাগ করে ?

তাহলে ঠ্যাঙাব খুব পড়ে পড়ে।

সে ভবিষ্যতের কথা ভেবে মায়ের আনন্দ হল কি দুঃখ হল বোঝা গেল না। কেবল দেখা গেল ছেলেটাকে সে বুকের কাছে নিয়ে দোলা দিচ্ছে। ছেলেটার চোখ বুজে আসছে আস্তে আস্তে।

আসলে রুগ্ন ক্ষ্যাপা ছেলেকে শান্ত করার এই বোধ হয় মায়ের কৌশল।

ওইটুকু তার শান্তি। মায়ের এই খোলা বুক, নগ্ন কোলটুকু সে চেয়েছিল নিরঙ্কুশভাবে। কিন্তু পায়নি। আরও ভাই বোন এসেছে বছরের পর বছরে। বিষ খেয়ে মা অমৃত ধারণ করত বুকে। অমৃত-হারা হয়ে, বাইরের খাবার খেয়ে কঠিন রোগ ধরেছে তাকে। মায়ের কোলের জন্য হিংসে এসেছে। বিদ্বেষ ও আক্রোশ তার সকলের উপরে। বিশেষ, একঘেয়েমি, গাম্ভীর্য, সুরহীনতা তার সহ্য হয় না একটুও। যখন পা ছুটোতে ছিল ক্ষমতা, তখন গঙ্গারধারে সাহেব কুঠির কাছে গিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকত। সাহেব মেম দেখত,

আর্দালিকে জিজ্ঞেস করত নানান কথা। রোগ, মায়ের কোলের শোক যেত ভুলে। স্বপ্ন দেখত বিলেত যাবে, মেম বিয়ে করবে। সেই স্বপ্নটুকুই কচি রুগ্ন মনে বাসা বেঁধে আছে। সব যন্ত্রণায় ওইটুকু ধরিয়ে দিলেই শান্ত হয়ে যায়। মায়ের কোলে দোলা দিলেই ঘুমে ঢলে পড়ে।

কিন্তু এখানকার সমস্ত কিছু হঠাৎ গোবিন্দের প্রাণের মধ্যে অত্যন্ত ভারী হয়ে চেপে আসে। অস্বস্তিতে ছটফট করে তার সর্বাঙ্গ। সমস্ত দুঃখ দৈন্য অনাহার নিয়েও খোলা আকাশ, পথের পর পথ, দিগন্ত-বিসারী মাঠ তাকে ডাক দেয়। সংসারের, ঘর-বেষ্টনীর বেড়াজালের বাইরে সেই নিঃসঙ্গ মুক্ত বাউলের ডাক এ পরিবেশকে যেন আরও যন্ত্রণাদায়ক করে তোলে। চব্বিশটা ঘণ্টা না কাটতেই পালাই পালাই করে উঠে তার মনে।

কিন্তু কালোকে বেরিয়ে আসতে দেখেই মনটা আবার তার থিতিয়ে যায়, মনে পড়ে যায় কালকের দুর্যোগময়ী সন্ধ্যার কথা। বাড়ি-ওয়ালার আহ্বান, সমস্ত মানুষগুলোর সরলভাবে হাসি দিয়ে তাকে গ্রহণ। আর গতকাল রাত্রে সে নিজেই না কত কথা বলেছে কালোকে। বাঁচা অনেক দুঃখ, অনেক যন্ত্রণায় ছাইমাখা সোনার মত বাঁচা।

নরক বটে! কিন্তু এ জগতে কাজের বিনিময়েই বা কজনা ডাকে দু-মুঠো পেটে দেওয়ার জন্য, অন্ধ কুঠরির আশ্রয়ের জন্য।

কালোর মুখের দিকে দেখল সে। সে মুখ মেঘলাভাঙ্গা রোদের মত আলোছায়ায় ভরা। বোধকরি সেই আলোছায়ার মধ্যেই একটি বিবাগী হাসির রেখা লেগে রয়েছে তার ঠোঁটের কোণে।

এসেই বলল গোবিন্দকে, বাঃ একেবারে নির্জলা ফোরটুয়েন্টি করছ বসে বসে? রাঁধবে কখন? বাঁক আর টিন নিয়ে কল থেকে জল নিয়ে এস।

গোবিন্দ এক মুহূর্ত কালোর মুখের দিকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। ঠিক এ সময়েই ফুলকি পেছন থেকে বলে উঠল, এই বুঝি

সেই ফোরটুয়েন্টি ?

গোবিন্দ ফিরে তাকাল। প্রায় তেমনি অগোছাল ফুলকি, উড়ু উড়ু চুল, রাত্রির নেশার ছাপভরা মুখ। ঠোঁটের কোণের হাসিতে যেন বিদ্রূপের আভাস। সে দাঁড়িয়েছে বেঁকে, বাঁকা চোখে তাকিয়ে আছে। কাপড় পরার ধরনটা তার ছত্রিশগড়ি আঁটসাঁট ও চড়াই উৎরাইয়ের মত।

কালো বলল, হাঁ, এই ফোরটুয়েন্টিবাজ, ভারী রসিক, জান্‌লি ?

গোবিন্দ একটু হেসে উঠল।

ফুলকি বলল, তা বাড়িওয়ালার দেখছি পছন্দ আছে। তবে--

কপালের টিপ ঝিলিক দিয়ে বলল, হাসিটা আর চোখ দুটো কিন্তু সুবিধের নয় বাপু, সাবধান। ও কোন্ অওরতকে কখন ফোরটুয়েন্টি করে দেবে কিছু ঠিক নেই।

বলে দুরন্ত বেগে খিলখিল করে হেসে উঠল।

কালো হেসে উঠল তার সামনের দুটি দাঁতহীন ফাঁক দিয়ে।

গোবিন্দ তেমনি হেসে বলল, যাকেই করি, তোমাকে তো পারব না !

ও মা গো ! ঢলে পড়ল ফুলকি হাসিতে, এ যে খুব কথা বলে গো ! তা আমি যে প্রেমযোগিনী······কখন মরব কে জানে।

বলে সে একবার চকিতে কালোর মুখের দিকে দেখে নিল। কালো যেন অর্থহীনভাবে হ্যা হ্যা করে হাসছে।

গোবিন্দ পেছোয় না। বলল, তা তোমাকে মারার ক্ষ্যামতা নেই বাপু আমার।

বুঝে গেছ ? বলে চকিত কটাক্ষ একবার দেখে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল ফুলকি। সে হাসিতে একটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের আভাস যেন।

গোবিন্দ তাকিয়ে দেখল পাশে কালো নেই। কোথায় গেল ? রান্নাঘরে ঢুকে দেখল একটা অন্ধকার কোণে কুলোর মধ্যে চাল নিয়ে কালো কাঁকর বাছার জন্য তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বিড়বিড় করছে, শালা মরে গেছি।···

কি কথা যেন গোবিন্দের মুখের কাছে এসেও ফিরে গেল। সে বাঁক আর টিন নিয়ে গেল বেরিয়ে।

তারপর ঘণ্টা কয়েক বাদে বস্তিটা আবার জমে ওঠার চেষ্টা করে। সবাই ঝটপট আসে, খায়, খেয়ে চলে যায়। যত তাড়াতাড়ি আসে, তত তাড়াতাড়ি খায়। ছোটে তার চেয়েও তাড়াতাড়ি।

কোন কোন ঘরে হঠাৎ মারামারি লেগে যায়। সেখানে রান্না হয় নি, ক্লান্ত ক্ষুধিত পেটে দেওয়ার কিছু নেই। কিন্তু পেট আর মেজাজ তা মানবে কেন। শুরু হয়ে যায় মারপিট বউ বাচ্চাগুলোর উপরেই। ফলে শুরু হয় কান্না, গালাগালি। ঠিক এ সময়েই হয়তো ওঠে সেই বুড়োটে গুরুগম্ভীর গলার গান। এত নির্বিকার, নির্বিরোধ সেই গলার সুর।

হাঁক পড়ে বাড়িওয়ালার বাজখাই গলার, আবির্ভাব হয় তার বিরাট লোমশ বপুর।

তারপর সারা দুপুরটা যেন বস্তিটা ঝিম্ মেরে পড়ে থাকে। বেকার মেয়েরা ও ছোট বাচ্চারা থাকে ঘাটে মাঠে রেললাইনে গোবর পোড়া কয়লা কাঠের সন্ধানে। সমস্ত বস্তিটা থেকে যেন ভাপ উঠতে থাকে, ভ্যাপ্সা দুর্গন্ধ একটা এসময়েই যেন ফাঁক পেয়ে ছড়িয়ে পড়ে। পাশের সুদৃশ্য বাড়িটার নরনারীদের কথাবার্তার দু-চারটে হালকা টুকরো ভেসে আসে নিরালা পেয়ে, নয়তো রেডিওযন্ত্র বা কণ্ঠ সংগীতের রেশ ভেসে আসে, যেন কোন্ সুদূর অমরাপুরী থেকে সুরের মায়া ঢেউ দিয়ে যায় মর্তের এ অন্ধ পাতালে। জানালার সুদৃশ্য পর্দা খুলে যায় কখনো। একটি মুখ, কিংবা বিচিত্র রং জামা উঁকি দেয় জানালা থেকে।

আর অন্যান্য সময় ঝামেলায় হট্টগোলে যখন নজর করা যায় না, সেটা এখন দেখা যায় যে, ওই বাড়িটার দোতলা জানালা থেকে

সব সময়েই কিছু না কিছু খোলার চালটায় পড়ছে। থুতু, মেয়েদের আঁচড়ানো চুলের ঝরা গুচ্ছ, কাগজের টুকরো, পরিত্যক্ত ন্যাকড়ার ফালি, এক ঝলক জল। যেন খোলার চালাটা একটা আস্তাকুঁড়। আর বাড়ির পেছনের জানালা দিয়ে কিছু ফেলতে গেলে ওখানে এসে সব পড়বেই।

গোবিন্দের নজরে পড়ল, সেই সকাল থেকে একটা ঘর একইভাবে দরজা খোলা পড়ে আছে কোণের দিকে। দরজাটার সামনে দুটো এ্যালুমিনিয়ামের বাসন পড়ে আছে এঁটোর শুকনো দাগ নিয়ে। কেউ সারা দিন সেদিকে একবার তাকিয়েও দেখেনি। বোধ হয় ঘরটায় মানুষ নেই। কোন সাড়া শব্দও পাওয়া যায় না।
সে আস্তে আস্তে গিয়ে দরজাটা খুলে ফেলতেই ধ্বক্ করে উঠল তার বুকটার মধ্যে। আড়ষ্ট কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে পড়ল। বুঝি দম নেই তার, বুকের ধুকধুকিটা স্তব্ধ হয়ে গেছে। অসাড়!
সে ভয়বিস্মিত চোখে দেখল, বাঁশের খাটিয়ার ময়লা স্যাঁতসেঁতে কাঁথার উপর কঙ্কাল শোয়ানো রয়েছে একটা! একটা ময়লা শাড়ি দিয়ে গলা থেকে পা অবধি তার ঢাকা। সেই কঙ্কালের কপালের নীচে আছে শুধু এক জোড়া অসহ্য ঝক্‌ঝকে বড় বড় চোখ, মণি দুটো যেন আগুন ধরানো মানিক। সমস্ত খাটিয়ার নোংরা বিছানাটার মধ্যে ওই চোখজোড়া ছাড়া আর কিছু নেই।
দরজা খোলা ও মানুষের সাড়া পেয়ে সে চোখ যেন তীব্র অভিশাপে জ্বলে উঠল যেন নিঃশব্দে অথচ ঝন্‌ঝন্ শব্দে ভেঙে পড়ল পাতালের অন্ধ শাস্তি। একবার বোধ করি নড়েও উঠল সেই কঙ্কালমূর্তি, একবার কেঁপে উঠল বা তার নাকে পরানো রূপোর নাকছাবি।
এমনি একটু সময় তাকিয়ে থাকার পর অন্ধকারটা থিতিয়ে এল, তখন গোবিন্দ চমকে উঠে আরও দেখল, একটা পাথরে কোঁদা কালো মূর্তি ড্যাবা ড্যাবা চোখে ভূতের মত ঘাপটি মেরে বসে আছে

ঘরের কোণে। খালি গা, খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি মুখ ভর্তি।
গোবিন্দের মনে হল যমের দোসর চুপে চুপে এসেছে আত্মাহরণ করতে। কি করবে সে হঠাৎ ভেবে পেল না। চলে যেতেও পারল না, জিজ্ঞেস করতেও পারল না কিছু।
ওখানে কী দেখছ ফোরটুয়েন্টি? বলতে বলতে কালো এসে পড়ল এখানে।
গোবিন্দ যেন ধড়ে প্রাণ পেল। কালোও একবার সে দৃশ্য দেখে আপন মনে মাথা নাড়ল। বলল, ও আমাদের লড়াকু গণেশ আর ওইটে ওর বউ, ব্যামো হয়েছে। ওরা দুটোয় একদিন এ বস্তি মাথায় করে রাখত। বলে সে এক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল, গণেশ, কতদিন তুই এভাবে পড়ে থাকবি?
অন্ধকারের মূর্তি সে কথার কোন জবাব দিল না। চোখ ফিরিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ সেখান থেকে উঠে খাটিয়ার পাশে এসে একটু দাঁড়াল। তারপর ঝুঁকে পড়ে গোবিন্দ ও কালোর দিকে ফেরানো বউয়ের মুখটা ঘুরিয়ে দিল আস্তে আস্তে অন্যদিকে। পিঠের তলে চাপা পড়া চুলের গোছা আলতো করে সরিয়ে শিয়রের দিকে এনে ছড়িয়ে দিল। তারপর যেন সেই কতদূর থেকে ডাকল ধীরে ধীরে, দুলারী বউ।...
কঙ্কাল মেয়ের সেই চোখের পাতা যেন আরও খানিক খুলে গেল আর সে দৃষ্টি হয়ে উঠল এক প্রেমবতীর অনুরাগ ভরা। একটু বুঝি বা নড়ল তার ঠোঁট। নিরালংকার হাত একটু তোলার চেষ্টা করল, পারল না।
গণেশ তাড়াতাড়ি সেখানে বসে পড়ে কাঠি কাঠি হাত দুটো তুলে নিল। মুখের কাছে গিয়ে দুলারীকে জিজ্ঞেস করল, দরদ হচ্ছে? দে একটু হাত বুলিয়ে দিই।
তারপর হাতটার দিকে তাকিয়ে বলল, ভেঙে না যায়!
কালো তার স্বভাবগত থম্‌ধরা ভাব থেকেই হঠাৎ বলে উঠল, শালা নিজেই মেরে ফেলেছে বউটাকে, তা বুঝবে না, বুঝবে না।

গোবিন্দ নিঃশব্দে তার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। কালো সেই চাউনির জবাবেই বলল, তা নয়তো কি? ও কামে যাবে না বউ ছেড়ে, কামাই করবে তো কি হবে? কোথায় ডাক্তার কোথায় দাওয়াই? বলে, কি করে ছেড়ে যাই, কখন মরে পড়ে থাকবে। আমি সামনে বসে থেকে ওর মরণ দেখব। বেতমিজ!

বলতে বলতে কালোর গলাটা অস্বাভাবিক মোটা আর ধীর হয়ে এল, অথচ ওর কামাইয়ের পয়সা এ বস্তির সবাই হাত পেতে নিয়েছে তাদের দুঃখ ধান্দায়। ওদের দুটো প্রাণ ছিল, হ্যাঁ? কিন্তু বউটা ব্যামোয় পড়ল আর ডাক্তারও শালা তেমনি এত এত টাকা চায় খালি। বলে, আজ দশ, কাল বিশ, কি ব্যামো রে বাবা। এত এত টাকার দরকার, আর তার মধ্যে ও ক-দিন ধরে কলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এত নিবাশ এত উদাস···

আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল কালো, রুদ্ধশ্বাস গলায় বলল, হ্যাঁ তেরো দিন হাজত খেটেছে এই আমাদের জন্য। আধপেটা রেশনের খিদায় হরতাল হয়েছিল। তখন এই গণেশ ফটিচার ম্যানেজারের গলা ধরে কারখানা থেকে বার করে দিয়েছিল। হ্যাঁ···আর ওর বউ ওদের···এত মহব্বত।

হারিয়ে গেল কালোর গলার স্বর এবং এদের সেই গভীর মহব্বতের কথা বলতে গিয়ে বোধ হয় তার বুকের ক্ষতটা খোঁচা খেয়ে দগদগে হয়ে উঠল। কিন্তু যার উদ্দেশ্যে এত কথা, সে একবারও মুখ তুলল না। গোবিন্দ কেবলি ভাবল, এ কী সর্বনেশে, কর্মনাশা সব-ভণ্ডুল-করা ভালবাসা! বুঝি তার প্রাণটা মস্ত বড় বলেই!···গণেশ আর দুলারীর দিকে তাকাতে গিয়ে তার চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠল সেই ছুতোর বউয়ের ছবি, সেই কঙ্কালসার মায়ের উঠোনভরা দাপাদাপি।

ইস্! এ কী হতভাগা জায়গায় এসে পড়েছে সে। যেখানে সমস্ত কিছুই প্রাণান্তকর, কালোর সেই উপহাসের মতই মৃত্যুগামী, অবসাদগ্রস্ত নিরাশার জঞ্জালে ভরা! যেখানে আছে শুধু রোগ

শোক পীড়ন আর তাকে এড়াতে গিয়ে ক্ষণিকের লালসা চরিতার্থতা, মুহূর্তের ফুর্তি। যেখানে কেবলি জীবনের ফেলে আসা গ্লানির ছবি বারবার সামনে এসে দাঁড়ায় সেখান থেকে পথে পথে নিঃসঙ্গ জীবনই ভালো নয় কি। করাত হাতে পথে পথে 'ছুতোর মিস্তিরি চাই' বলে শ্রমের কথা হেঁকে হেঁকে দেশ হতে দেশান্তরে যাব। গাঁয়ের মারী ব্যামো গাঁয়ে থাকবে ঘরের শোক মুখ দিয়ে পড়ে থাকবে ঘরে, ভালবাসা বাসা বেঁধে থাকবে, হৃদয়ে ছাড়াছাড়ির পোড়ানির জন্য। আকাশ ফুঁড়ে বৃষ্টি আসবে, শুকোবে আবার. ঝড় আসবে সেও যাবে।···থাকবে শুধু পথ। আমি সব পেছনে ফেলে চলে যাব দিক হতে দিগন্তে মুক্ত পাখির মত। মরণও যেদিন আসবে, আসবে মৃত্যুদূত একাকী হঠাৎ পথের উপর, তার কাছে প্রাণ সঁপে দিয়ে বলব, চল। আর কিছুই চাইনি, তোমার জন্যই অপেক্ষা করেছিলাম। আজ এসেছ। কী ভাগ্যি, দশজনের সামনে আমার এ পোড়া প্রাণ হারাতে হয়নি। আমি সে ভীড় চাইনি।

পেছনে তাকিয়ে দেখল বাড়িওয়ালা এসে দাঁড়িয়েছে। তার ঘন গোঁফ ও খোঁচা দাড়িভরা মুখটা দলা পাকিয়ে উঠেছে কুঁচকে। চোখ নেই, আছে একজোড়া মোটা মোটা লোমশ ভ্রূ। ফোলানো নাকের পাটার পাশে গভীর কোঁচ দুটিতে তার ব্যথা না রাগ কিছু বোঝবার যো নেই। সে আপন মনে বলতে লাগল, কোন দোষ নেই আমার, আমি কী করব। কলে যাবে না, কামানো বন্ধ করল। আমি কী করব।

তারপর আশেপাশে কেউ নেই দেখে বলল, হাসপাতালের মত পাকা বাড়ি হলে এরকম ব্যামো হত না। বস্তি কিনা!···কিন্তু ওকে এবার আমি মেরে কাজে পাঠাব, ঠিক দেখে নিও।

তবু গণেশ মুখ তুলল না দুলারীর উপর থেকে। দুলারীর রুগ্ন দেহের বেদনায় লয় হয়ে গিয়ে সে হাত বুলোচ্ছে। বুঝি না সে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে, না মৃত্যুকে প্রতিরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে অতন্দ্র

প্রহরীর মত।

সে দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে একসময় অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল গোবিন্দ। যেন দুলারীর ব্যামো এসে গ্রাস করতে চাইছে তাকে, নোংরা দুর্গন্ধ কাঁথা কাপড়গুলো জড়িয়ে ধরছে তাকে। ছুতোর বউ যেন শুয়ে শুয়ে দাপাচ্ছে খাটিয়াটার উপর, মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে তার সামনে। এমনি করেই মরবে ছুতোরের বউয়ের মত বউয়েরা।

দেহের রক্তবিন্দুতে অণুমাত্র শক্তি থাকলেও মানুষের হৃদয় অথর্ব হয়ে থাকতে পারে না। দুর্বিপাকে সে মানে না কোন সঙ্কোচ, কোন লজ্জা। একদিন সে তার উত্থানশক্তি রহিত এ শরীরকে দিয়েছে। ধিক্কার দিয়েছে কৃপণ মৃত্যুকে, যে তাকে না মেরে চোখ ভরে দেখিয়েছে ছুতোর বউয়ের মরণ। আজ সে কেমন করে চুপ করে থাকবে! তবু সামনে এগুতে গিয়ে সে যেন চকিতে কিসের এক সংকোচে থেমে গেল। পরমুহূর্তে সে হঠাৎ ঘরে ঢুকে শক্ত হাতে গণেশকে টেনে দাঁড় করাল। তারপর স্থির চোখে কঠিন গলায় বলল, সরে দাঁড়াও, সরো।

মনে হল, মৃত্যুদূতের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল স্বয়ং জীবন।

গণেশ আচমকা ভ্যাবাচাকা খেয়ে উঠে দাঁড়াল। অর্থহীন বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল গোবিন্দের দিকে।

কোনও এক অন্য জগৎ থেকে যেন ফিস্‌ফিস্ করে বলল গোবিন্দ, তুমি আবার ঘর করবে বউ নিয়ে?

কিন্তু মৃতপ্রায় দুলারীর চোখে ধ্বক্‌ধ্বক্ করে আগুন জ্বলে উঠল আশ্চর্য! এখনও এত আগুন আছে তার চোখে! যেন ফণিনী মাথার মণি কেউ কেড়ে নিয়েছে। গোবিন্দ তাড়াতাড়ি গণেশের জায়গাটিতে এসে বসল। পরিবেশ বিস্মৃত এক বিচিত্র মানুষ সে। চোখে তার অদ্ভুত আলো। দুলারীর দিকে চেয়ে আকুল গম্ভীর গলায় বলল, মরবে? কোন সুখে? মরে তুমি লড়িয়ে মানুষটাকে মারবে? তুমি চাইলে তোমাকে সবাই দেখবে। গণেশের

এখনো কত ক্ষ্যামতা, ওকে কাজ কামে পাঠাও, মাইরী বলছি।

বলতে বলতে গালটা চেপে এল গণেশের। চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল। তবুও বলল ফিস্‌ফিস্ করে, মাইরী কোন্ শালা মিছে কথা বলে।

কালো বাড়িওয়ালা, সবাই কাট! যেন সত্যি কোন গুণতুক্ করছে ফোরটুয়েন্টি গোবিন্দ, এমনি তাদের ভাব।

দুলারীর অপলক জ্বলন্ত চোখ যেন আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে এল, খানিকটা সংশয় ও বিস্ময়ের ছায়া এসে পড়ল সেই চোখে। খানিকক্ষণ এমনি তাকিয়ে থাকতে থাকতে কয়েকবার চোখের পাতা কেঁপে উঠে তা বন্ধ হয়ে গেল। দু-ফোঁটা জল চক্ চক্ করে উঠল চোখের কোণে। তার কানে লেগে রইল, বাঁচো, বাঁচো গণেশের বউ।

কয়েক মুহূর্ত একেবারে স্তব্ধ। গোবিন্দ নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে গণেশকে বলল, আর কাঁথাটাথা আছে?

গণেশ ঘাড় নেড়ে জানাল আছে।

গোবিন্দ বলল, বার কর।

গণেশ যাদুকরের মন্ত্রদণ্ড-নির্দেশচালিতের মত একটা চটের বোঁচকা খুলে একখানা নক্‌সী কাঁথা বের করল। কাঁথাটির চারপাশে লাল সুতো দিয়ে গোলাপ কুঁড়ির বেড়া। মাঝখানে নীল সুতোর ঘন ঘন ফোড়ের মধ্যে মস্ত একটি পদ্মফুল। গণেশ হয়তো তাব দুলারী বউয়ের এ স্মৃতি রেখে দিতে চেয়েছিল।

গোবিন্দ তার হাত থেকে কাঁথাখানি নিয়ে বলল, বউকে কোলে কর, আস্তে করে তোল।

গণেশ মুহূর্ত দ্বিধা করে স্থির রইল, তারপর দু-হাতে ভালো করে সাপ্‌টে তুলে নিল দুলারীকে বুকের মধ্যে।

কালো এবং বাড়িওয়ালা স্তব্ধ বিস্ময়ে এ দৃশ্য দেখছিল। তাদের বাক্য রহিত হয়ে গেছে একেবারে। গোবিন্দ দুলারীর পরিত্যক্ত বিছানা ধরে টান দিল। ইস্, বিছানা শুধু স্যাঁতসেঁতে নয়, খানে খানে ভেজা এবং ময়লা গন্ধ ও দাগ রয়েছে। কিন্তু সে থামল না।

সে বিছানা তুলে ছুঁড়ে ফেলল বাইরে। খাটিয়াটা থেকে যেন রোগের ভাপ বেরুচ্ছে। তারপর সে খাটিয়াটা ঘরের বাইরে নিয়ে এসে রাখল খোলার ছাউনি ছায়ায়। বারকয়েক জোরে জোরে মাটিতে ঠুকে ঝেড়ে নিল। তারপর সেই কাঁথাখানি দিল পেতে।

পেতে দিয়ে বলল গণেশকে—দেও, শুইয়ে দেও।

গণেশের এক মুহূর্ত দ্বিধার ফাঁকে কালো জিজ্ঞাসা করল, বাইরে?

হ্যাঁ, এই আকাশের তলায়, এই রোদে হাওয়ায়, দরকার হলে মাঠের ধারে রেখে আসব ওকে সারাদিন। দৃঢ় গভীর গম্ভীর গলায়, শান্ত অথচ আবেগের স্বরে বলল গোবিন্দ, রোগ তো ওই নোংরা বিছানায়। ·········ওই ঘরে, ঘরের ওই অন্ধকারে। রোগ তো ভাঙা টুণ্ডা বুকে, মরণ যেখানে সব শেষের ভরসা নিয়ে বসে আছে। গণেশের বউ যদি বাঁচে, তো বাঁচবে বাইরেই। যদি বাঁচে, তো বাঁচবে গণেশের বাঁচার সাধের জন্য। গণেশ আস্তে করে শুইয়ে দিল তুলারীকে সেই বিছানায়। প্রথম আলোর পলকটা সইল না তার চোখে। কয়েকবার পিটপিট করে চোখ বুজে রইল সে। আলোতে তার কঙ্কালসার শরীরের বর্ণ বদলে গেছে। ভাবলেশহীন মুখে তার ভাবের সঞ্চার হয়েছে যেন, সুশীতল আরামের একটা উদার ছাপ পড়েছে যেন তার মুখে।

গণেশ তুলারীর চোখে জলটুকু মুছিয়ে দিল।

গোবিন্দের বারবার মনে হল, সকালে আজ ফুলকির পায়ের কাছে বসে কালো যে মরণ চেয়েছিল, সেই মরণের নেশায় বুদ হয়ে তুলারী তাড়াতাড়ি মরতে চেয়ে মুক্তি দিতে চেয়েছিল গণেশকে। কিন্তু সে কি মুক্তি?

হ্যাঁ, মুক্তি সে পথের, দূর-দূরান্তরের, সবছাড়ার, সব হারানোর।···তবু হায়রে মানুষের মন! যে আকাশটুকু না হলে তোর বাঁচন নেই, সেই আকাশের তলায় তুই আবার গড়িস্ ঘর, বেঁচে থাকিস্ রোগ বালাই নিয়ে, ঝড়ে বন্যায় দাঁড়াস বুক দিয়ে, নাড়ি-ছেঁড়া তোর রক্ত বীজের ধন দিয়ে করিস সোহাগ। পৃথিবী ছাড়ালে কি ছাড়িয়ে যাওয়া যায়

মানুষকে। আর পৃথিবী জুড়ে আছে পথ, কিন্তু তার ধারে ধারে আছে কোটি ঘর।

ভাবতে ভাবতে বুকটা বড় টনটন করে উঠল গোবিন্দের। গণেশকে বলল নোংরা বিছানাগুলো দেখিয়ে, যাও, ধুয়ে নিয়ে এস এগুলো। গোমড়া মুখে এট্টু হাসো, হাসো, আমার মুখের দিকে দেখলে আর কি হবে। জানটা অত সস্তা নয়, বুঝেছ।

তারপর স্বভাবসিদ্ধ বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হেসে বলল, জানো কালো, মরব তো সবাই, এ ব্যাটা আগেই ফাঁকি দিয়ে মরতে চায়। তা কি হয় চাঁদ! হা হা হা! মনে মনে বলল, পথ, যদি সময় আসে তোমার কাছে যাব। কিন্তু ছুতোর বউ, তুই বাঁচিস দুলারী হয়ে, প্রাণ ভরিস দশজনার গণেশের, নইলে ছাড়ান নেই আমার।

গণেশ খানিকটা অবাক নির্বোধের মত বিছানাগুলো নিয়ে চলে গেল। কিন্তু গোবিন্দের হাসিতে কেউ যোগ দিতে পারল না। তারা তেমনি তাকিয়ে রইল গোবিন্দের দিকে।

গোবিন্দ এক মুহূর্ত সবাইকে দেখে সেখান থেকে চলে গেল। সে লজ্জা পায়নি। তার হাসি পায়নি। তার গলার কাছে ঠেলে আসছিল কিছু একটা। মনে মনে বলছিল সে, উল্লুক! দুনিয়াটা শালা এক একসময় উল্লুক হয়ে যায়।

বাড়িওয়ালা তেমনি হতবাক হয়ে মুখ ঘুরিয়ে তার চলার পথের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখ ফিরিয়ে তাকাল কালোর দিকে। যেন এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি।

হঠাৎ বাড়িওয়ালা বলে উঠল, এ যদি ফোরটুয়েন্টি না হয় তো, আর কি হতে পাবে আমি জানি না। নইলে শালা জরুর কেরেস্তানদের পাদ্রীবাবা ছিল।

কালো বলল, দাগা খাওয়া মাল কি না। শালা পাগলও হতে পারে।

অমনি বাড়িওয়ালা খেঁকিয়ে উঠল, তোর মত, না?

কালো ভাঙা দাঁত দুটো বার করে বলল, তোমার মতও হতে পারে।
একটা ঘুষি শূন্যে তুলে থেমে গেল বাড়িওয়ালা।
ফিরে যেতে যেতে খালি বলল, সব শালা চারশো বিশ। সব কটাকে হাটাবো এখান থেকে দাঁড়া
তবুও তারা বুঝল, তাদের মনে একটা বিস্ফোটক তীব্র ব্যথায় টনটন করছিল। সাহস এবং ভরসা করে গোবিন্দ মুক্ত করে দিয়েছে বিষটুকু।
কেবল নির্বাক দুলারী অপলক চোখে তাকিয়ে রইল শূন্যে। আর তার বুকের ধীর ধুকধুকীতে বাজতে লাগল, বাঁচতে চেয়েছি। আর কেন যেন তার বার বার মনে হল, গণেশ ভালবেসে মরতে চায়নি। জীবনের উপর রাগ করে সে মরতে চেয়েছিল। ও মানুষটা এসে সব ভেঙে দিল। মানুষটা, কে মানুষটা। মনে হয়, কতকালের চেনা, যেন তার জীবনের চিরদিনের বন্ধু ওই আদমিটা।

দু-দিন কেটে গেল।
সন্ধ্যা ঘনায়।
গোবিন্দ কয়লা ভাঙছে।
সারা বস্তিতে কোলাহল শুরু হয়েছে। বাইরের মানুষেরা ঘরে ফিরেছে সব। তাদের কথাবার্তা, গান গল্প ঝগড়া বিবাদের শেষ নেই। অভাব নেই প্রসঙ্গের। এর মধ্যে আছে মাতালের নেশামত্ত ধ্বনি, দুনিয়াকে থোরাই কেয়ার করার বুক-ঠোকা বাহাদুরি কিংবা ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ কোন দুঃখের কথা মনে করে সুর করে।
শুরু হয় ফুঁপিয়ে কান্না। কেউ কেউ টেরি পোশাক বাগিয়ে শরিফ মেজাজে বেরিয়ে পড়ে, কারো কারো থাকে অভিসারের তাড়া।
এর মধ্যেই চলেছে দিল-ছিপছুপ মহব্বতের রঙ্গ খেলা, ইশারার গান দু-এক কলি। যারা একই কারখানায় অনেকে কাজ করে তাদের বসেছে মজলিশ। কোন্ সাহেব ভালো আর মন্দ সে কথায় আছে

বহু পরস্পরবিরোধি যুক্তিতর্ক, কোন্ সর্দার কার কাছে কত টাকা খেয়েছে, কোন্ কেরানীবাবু কতটা ভাগ বসিয়েছে তাতে, ইত্যাদি থেকে শুরু করে এ দফার পার্ট ভালো না মন্দ, ঘড়িকলটা কি করে বিগড়েছে, ছাঁটাই, নয়া মেশিন, খারাপ আওরত এবং ওয়ার্কস কমিটির মাথায় হাত বুলোনো চাল পর্যন্ত। কোন কিছু বাদ নেই। এমন কি সাহেবদের কে কতটা মাতাল হয় ও ঘড়ি ঘড়ি সিগারেট ফোঁকে, কে একটু মজাদার ও মেয়ে মজুরের সঙ্গে জমাবার চেষ্টা করেছে এবং মেমসাহেবেরা কে কার স্বামীকে ফেলে দোস্‌রা সাহেবের সঙ্গে ফূর্তি করতে গিয়েছিল, ফলে কোঠিতে মারামারি লেগেছিল সাহেবদের মধ্যে—সে সব আলোচনাও এর মধ্যে যুক্ত হচ্ছে। ঘরোয়া আলোচনার মত।

বস্তির বাইরের রকে বসেছে বাড়ীওয়ালার নিজস্ব মজলিশ। আসলে সেটা গাঁজার মজলিশ। সেখানে যার যা খুশি তাই বলে। বলে বেশী বাড়ীওয়ালাই, সবাই তা শোনে। একটি বাঁধা আড্ডা। কিন্তু হট্টগোল নেই। আর যাদের একটু ঝামেলা কম, তারাই এসে বসে এখানে।

সেখানে খানিকক্ষণ উশখুশ করে কালো উঠে এল। সে চাকরি পেয়েছে, দৈনন্দিন উনুন আর হাঁড়ি ধোয়ার কাজ শেষ হয়েছে তার। তবু অনেক দিনের অভ্যেসের জন্য তার মনটা পড়েছিল রান্নাঘরের দিকে। তাছাড়া গোবিন্দের উপর তার মনটা কেমন পড়ে গিয়েছিল। সে এসে দেখল গোবিন্দ উনুনে ঘুঁটেতে ফেঁসোর আগুন ধরিয়ে কয়লা ছেড়ে দিচ্ছে। বেশ হাত চালিয়ে কাজ করছে গোবিন্দ। কয়লা ঢেলেই সে শিলনোড়া নিয়ে পড়ে।

বাঃ তুমি বেশ কাজের আছ তো? কালো হেসে হেসে বলল। তা দেখ, এ শালার কাজে দু-এক ছিলিম না হলে জমে না। জুত্ হয় না।

তা ফোকটিয়া পেলে—গোবিন্দ আড়চোখে তাকিয়ে হাসল।

কালো চোখ ঘোঁচ করে বলল, হুঁ? না বলতেই···?

বলে সে উঠে চলে গেল এবং একটু পরেই ফিরে এল বেশ দুরস্ত করে

সাজানো, হাতের চেটোয় ঘষা চকচকে কলকে নিয়ে। গোবিন্দের পাশে বসে বলল, নেও, টেনে নেও।

গোবিন্দ বলল, আরে আগে তুমি টানো।

না আগে তুমি।

তা কি হয়। তুমি একটা পাঁড় ওস্তাদ।

ও শালা যে টানে সে-ই মহাদেব হয়, ওস্তাদ বনে। নেও নেও।

উঁহুঁ, তুমি পেসাদ করে দেও।

শালা পাক্কা ফোরটুয়েন্টি। বলে অগত্যা কালো গোটা কয়েক টান দিয়ে কলকে তুলে দিল গোবিন্দের হাতে।

গোবিন্দের কলকে বাগিয়ে ধরার কায়দা দেখেই কালো ভ্রূ কোঁচকাল। তারপর টানের কেরামতি দেখে বেশ উল্লসিত গলায় তারিফ করে উঠল গোবিন্দের পিঠে চাপড় মেরে, বাঃ বাহ্‌রে ওস্তাদ, সবই জান দেখছি।

গোবিন্দ কোন কথা না বলে চোখ বুজে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কলকেটা তুলে দিল কালোর হাতে। কালো অবশিষ্টটুকু শেষ করে কলকে উপুড় করে দিল।

তারপর তারা দুজনেই কিছুক্ষণ ধোঁয়া তপ্ত রক্তচক্ষু নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ কালো বলে উঠল, তুই শালা পাগল আছিস্।

গোবিন্দও বলল, আমি যদি পাগল হই, তুই শালা ডবলপাগলা তা'লে।

কথা শেষে তারা দুজনেই হো হো করে হেসে উঠল। পরস্পরের মধ্যে তাদের অদ্ভুত জমে গেছে।

কালো বলল, আচ্ছা, তোর আর কে আছে বল তো, সত্যি বলবি।

গোবিন্দের গলাটা গাঁজার নেশায় পাল্‌টে গেছে। বলল. কেউ নেই।

মাইরি ?

মাইরি।···তবে এই তোমরা আছ।

বে সাদী কিছু—

হয়েছিল।

কী হল ?

কেটে পড়ল। বলে হাসতে গিয়ে মুখটা বিকৃত হয়ে গেল গোবিন্দের।

কালো ঠিক বোধ হয় বুঝতে পারল না লোকটা তাকে ফোরটুয়েন্টি করছে কি না।

গোবিন্দ নোড়া নিয়ে শিলের উপর উপুড় হতে গিয়ে হাত নেড়ে আবার বললে, আর আটকুড়ো নই, ছেলেমেয়েও হয়েছিল। সবশুদ্ধ গায়েব হয়ে গেছে। কালো বিশ্বাস করতে না পেরে গোবিন্দের মুখটা তুলে ধরল তার দিকে। গোবিন্দের লাল চোখ দুটো তখন যেন কোন দূরে পড়ে আছে, কি দেখছে।

কালো জিজ্ঞেস করল, কাটল কি রকম ?

খাবি খেয়ে খেয়ে, দাপিয়ে, ঠিক যেভাবে পোড়া মাছ মরে। বলতে বলতে গোবিন্দের গলাটা অত্যন্ত তীব্র আর চাপা হয়ে এল।

কালো গোবিন্দের মুখের কাছে মুখটা এনে তাকিয়ে রইল একটু, তারপর গোবিন্দের হাঁটুতে হাত রেখে যেন ঝিমিয়ে পড়ল, আর এক হাতে গোবিন্দের একটা হাত চেপে ধরল জোরে।

বাড়িওয়ালা কিছুক্ষণ আগেই এসেছিল কিন্তু এদের কথাবার্তা শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল দরজার আড়ালে। তারপর যখন দেখল ওরা পরস্পর ওইভাবে বসে রইল তখন প্রায় একটা হুংকার দিয়ে সে ঘরে ঢুকল। হুঁ! বাঃ সাজানো কলকেটি এনে এখানে দুজনে বেড়ে জমে গেছ ? আর আমি ওখানে গলা শুকিয়ে—

হাত ঝট্‌কা দিয়ে বলল কালো, তুমি বুঝবে না বাড়িওয়ালা, এসব আমাদের কথা।

বাড়িওয়ালাও তাদের পাশে বসে পড়ল এবং বিদ্রূপের স্বরে বলল, ওঃ দুনিয়ায় খালি তোদেরই ঘর সংসার ছিল, তোদেরই খালি সুখ দুঃখের কথা আছে, আর কোন মানুষের কিছু নেই।

না—তা বলছি না।

থাম্! ধমকে উঠল বাড়িওয়ালা। তারপর আপন মনে কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে চাপা গলায় বলে উঠল, কী হবে, কী হবে সে প্যান-প্যানানি গেয়ে? কী দাম আছে? আশমান থেকেও এক ফোঁটা পানি পড়বে না। তবে? ওই তো গণেশ, দুঃখ নিয়ে পড়ে আছে।

গোবিন্দ বাড়িওয়ালার দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক বলেছ তুমি বাড়িওয়ালা, ওতে কিছু হয় না।

হ্যাঁ, এই তুমি বুঝবে। বলে সে গোবিন্দের আরও ঘন হয়ে এল। বলল, বল তো এই সংসারে দুঃখ কার নেই? কার শালা কোন্ বাসনাটা পুরেছে, কে কি চেয়ে পেয়েছে?

পায় না, ঠিক। গোবিন্দ বলল, আর পায় না বলেই জানো কেউ শালা পাগল হয়, আর কেউ শালা সব ছেড়ে পথ ধরে। কিন্তু যাবে কোথায়? আর পাগল হলেও তার রেহাই কোথায়? মানুষের আশা কখনো মরে?

বলতে বলতে গোবিন্দের চোখের উপর ভেসে উঠল দুলারীর কঙ্কাল মুখ। হ্যাঁ, আশা যদি মরবে তবে দুলারীর ওই মরণোন্মুখ মুখ দেখে তার ছুতোর বউয়ের কথা মনে হয়েছিল কেন? আর কি বলে সে ছুতোর বউকে বাঁচতে বলল দুলারীর মধ্যে? নিজের জীবনে পোড় খেয়ে খেয়ে বুঝেছে, হতাশা সাপের চেয়েও বেইমান। একবার প্যাঁচ্ দিয়ে ধরলে ফোঁস করে ফণা তোলে মাথার উপরে। আবার বলল, জান, বাংলায় এট্টা কবিতা আছে।

'কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে কভু আশিবিষে দংশেনি যারে।' আমি যে শালা জানি। হাত-হপ্তা মিটিয়ে পেটের তেষটি মেরে যে ছেড়ে দেয়, সে এক দুশমন। আমাদের প্রাণে আর মনে আরো অনেক দুশমন আছে। সেসব তাড়াতে হবে, বুঝলে। ওই যে গণেশ, ওকে এট্টা দুশমন ধরেছিল, শালা, শুষে খেয়ে ফেলত ওকে।

কালো রক্তচক্ষু বড় বড় করে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। বলল, বা বা বা, শুনলে বাড়িওয়ালা। শালা যেন আমাদের গুপ্ত মাস্টারের

চেয়েও খাঁটি কথা বলে। বাড়িওয়ালা ভাবছিল অন্যদিক, সন্তর্পণে বলল, হ্যাঁ, মানুষের আশা কখনো মরে না। এই ধর সত্যি বলছি আমার টাকা খুব বেশী নেই, তবু জমিটা মৌরস করাতে পারছি না বলে—

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে শামুকের মত চোখ দুটো ভ্রূর তলায় ঢেকে তাকাল গোবিন্দের দিকে। বলল, মুখ ফেরালে কেন তুমি? মুখ ফেরালে কেন?

গোবিন্দ বলল, তো কি করব। তোমার মাথা একটু খারাপ আছে মাইরী।

আমার মাথা খারাপ, আর তোমাদের মাথা খুব সাফ? প্রায় মারতে উঠল বাড়িওয়ালা।

তা তোমার মত অত খারাপ নয়। তোমার যেন বাই। গোবিন্দও বলল খুব সন্তর্পণে। চোপ্! আমি বল্ছি চোপ্! শালা ফোর-টুয়েন্টি, তোমাকে আমি কালকেই তাড়াচ্ছি, দাঁড়াও। বলতে বলতে বাড়িওয়ালা উঠে পড়ল। বলল, কালো, এক কলকে সাজবি চল্। বলে বেরিয়ে গেল।

কালো বলল, ক্ষেপিয়ে দিলি তো?

ও ক্ষেপেই আছে। বলে গোবিন্দ তাড়াতাড়ি উঠে জ্বলন্ত উনুনে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে দিল। তারপর বসল বাটনা বাটতে। কালো বেরিয়ে গেল।

নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে লোটন বউয়ের। অপলক কিন্তু যেন ঠাণ্ডা শিরশির চোখে সে দেখছে নন্দ আর হরিশের কাণ্ডটা। ঠোঁট টিপে আছে, তবু কিছু বলছে না।

এও বড় বিচিত্র যে, নন্দ-হরিশ কল থেকে এসে বসেছিল চুপচাপ, কিন্তু নিতান্ত অকারণেই যেন কি কারণে হঠাৎ তাদের ঝগড়া লেগে যায়।

কোন কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ নন্দই হয়তো একটা দমকা নিশ্বাস ফেলে বলে ওঠে, নাঃ, একটা আলাদা ঘর দেখে চলে যেতে হবে। হরিশও চুপ করে থাকতে পারে না। কথাটা গায়ে পেতে নিয়ে বিদ্রূপ করে বলে, খালি ফুটানি। যেতে তো দেখি না।

লোটন বউ হয়তো কোন কাজ করছিল। এদের কথা শুনেই তার দৈনিক অভিজ্ঞতা থেকে দূরাগত এ্যাসিড গন্ধ পাওয়া সাপের মত সচকিত হয়ে মুখ তোলে আর তার মোটা নাক উঠতে থাকে ফুলে ফুলে। আর ওরা দুজন ভাই ভাই সুনিশ্চিত, তবু নন্দ বলে ওঠে, যাই না তো তোর বাপের কি?

তবে বলিস্ কেন বান্‌চোৎ?

আমার খুশি হয়েছে বলেছি।

তবে আমারও খুশি হয়েছে।

লোটন বউ নীরব।

শালা খুশ মানাচ্ছ। নন্দই এক ঘা প্রথম কষিয়ে দেয় হরিশকে। কেননা সে হরিশের চেয়ে বড়। তারপর শুরু হয়ে যায় রাম রাবণের লড়াই, গালাগাল। বস্তির আর সব গোলমালকে এ ব্যাপারটা ছাপিয়ে ওঠে বলেই, সকলের কান এবং নজরটা এদিকেই এসে পড়ে।

যে যার নিজের ব্যাপার ভুলে এদিকেই এগিয়ে আসে।

বাড়িওয়ালাও এল। যমদূতের মত এসে ধরল দুটোকে।

গোবিন্দ রান্নাঘর থেকে সব শুনতে লাগল কিন্তু গেল না। প্রায় কালকের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। সে মনে মনে বলল, তিনটের যে কোন একটা না মরলে এর ফয়সালা হবে না। কিন্তু যে নন্দ আর হরিশ পরস্পরের মধ্যে এত মারামারি করে, কালকে তারাই আবার একই সঙ্গে কেমন করে লোটন বউয়ের ডাক ছেড়ে কান্নায় সান্ত্বনা দিচ্ছিল। আর মার খেয়েই বা কেন তারা বিনা বিবাদে ঘাড় ভেঙে বসেছিল পহররাত অবধি ওই ঘরে দরজায়।

লোটন বউয়ের সেই ডাক ছেড়ে কান্না উঠল, ওরে আমার কেউ নেই

রে। ছুটো কুত্তা আমাকে জ্বালিয়ে খেল রে, আমাকে সকলে বে-ইজ্জত করছে গো! ··

কে একজন অসমসাহসী বির্‌হার সুললিত টানা সুরে গেয়ে উঠল,

আরে লোটনোয়া তু কঁহা গেইল্‌হ

কসম তোহার আরে মুঝে লে চলহ্‌।

কে একজন অমনি সরু গলায় বলে উঠল, আরে কৌন জানে কঁহা পতা মিলে।

একটা হাসির রোল পড়ে যায়।

লোটন বউও শুরু করে, তোদের গানে আমি এই করি, সেই করি।

নন্দ হরিশ করুণ চোখে সকলের দিকে তাকায়, কিন্তু কিছু বলতে পারে না। দুজনেই এক পা এক পা করে গিয়ে লোটন বউয়ের দু-পাশে বসে।

গোবিন্দ বেরিয়ে এসে বলল বাড়িওয়ালাকে, এখনই তিনটেকে ঘরে ঢুকিয়ে দেও না, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

সে ওরা নিজেরাই যাবে।

তবে মারামারি করে কেন ওরা ?

জিজ্ঞেস কর।

গোবিন্দ হরিশ-নন্দর দিকে তাকিয়ে বলল, কেন কর ?

অমনি লোটন বউ তাকে যেন খেতে এল, তোর কি রে, তোর কি তাতে ?

গোবিন্দকে চমকে উঠতে দেখে সবাই হেসে উঠল। কে একজন গোবিন্দকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠল। দেওনা ওদের ফোরটুয়েন্টি করে।

সবটাই যেন লোটন বউয়ের ব্যাপার, হরিশ নন্দকেও কেউ কিছু বলতে পারবে না।

গোবিন্দ তাড়াতাড়ি হকচকানিটা কাটিয়ে বলল, তুমি যে আমার ভউঝি লাগো। জবাবে লোটন বউ আরও কঠিন কটূক্তি করে নন্দ-হরিশকে ধাক্কা দিয়ে প্রায় ধরাশায়ী করে ঘরে ঢুকে পড়লো। বন্ধ

ঘরের ভিতর থেকেও তার বিলাপের সুর আসতে লাগল ভেসে
কেবল নন্দ আর হরিশ সেই দরজাটাতে মুখ দিয়ে পড়ে রইল
কেন ? কী দাসখত ওরা লিখে দিয়েছে লোটন বউয়ের পায়ে। কিন্তু
গোবিন্দের আবার মনে পড়ল লোটন বউ হয়তো বাধ্য হয়েই থাকে।
হয়তো পেটের জন্যই তাকে নন্দ হরিশের ঘরে থাকতে হয়।
তবু নন্দ আর হরিশকে দেখে মায়া লাগে। যেন দুটো অভিশপ্ত
জানোয়ার বহু লোকের সামনে চুপচাপ পড়ে আছে।
কালো এসে গোবিন্দের হাতে একটা টান দিয়ে বলল, তুই এসব
বেতমিজদের ব্যাপারে কথা বলতে গেছিস্ ? চলে আয় দোস্ত,
এখানে কোন ফোরটুয়েন্টি চলবে না। গোবিন্দ রান্নাঘরের দিকে
চলে গেল কালোর সঙ্গে।
কালো আবার বলল, কুত্তা ঘেউ ঘেউ কেন করে, ষাঁড় কেন গোঁ ধরে,
যাবত তোমার পিথিমীর অনেক কাণ্ডই অনেকে বোঝে কিন্তু
বেগড়ানো মেয়েমানুষকে বোঝে তেমন সাধ্যি কারো নেই। অমন
যে একটা জোয়ান পাট্টা ছিল লোটন, সেটাকেও দেখতাম মাগীটার
কাছে কেঁচোর মত পড়ে থাকত। বলি কেন ? না, ওর প্রাণে
বিষ আছে।
গোবিন্দের মুখটা যেন কি অসহায়তায় থম্ ধরে রইল।
আশ্চর্য ! নন্দ আর হরিশ আবার পরস্পরের দিকে তাকায়, আর
মুখ নামিয়ে থাকে। যেন পরস্পরের কাছে তারা অনুশোচনা প্রকাশ
করতে থাকে। বিচিত্র আদিম তাদের এই জীবন। একজনকে
নিয়ে তাদের কখনো বিদ্বেষ, কখনো বন্ধুত্ব। আর তার চেয়েও
বিচিত্র আদিম নারী লোটনের বউ, যে সমস্ত ঝগড়া মারামারি, কলঙ্ক,
লজ্জা, ভয়, সব ভুলে আবার ডেকে নেবে ওদের।
ঠিক এই হট্টগোলের ঝোঁকেই সেই গুরুগম্ভীর বুড়োটে গলার গান
উঠছে,

ওরে, অমর কেউ থাকবি না তো, মরতে হবে সবারে,
ভবে সমসারে তোর এত ভেদ-জ্ঞান কিসের তরে।

আর ঠিক প্রত্যহের মত সেই রুগ্ন ছেলেরা তখনো ঘুমায়নি কিংবা জেগে গেছে। গান তার কানে যেতেই ভেংচে উঠল সে তারস্বরে।

এমন সময়ে এল তার বাপ। হঠাৎ মনে হয় লোকটা মানুষ নয়, একটা পাঁশটে রং-এর মন্থরগতি ক্রুদ্ধ মোষ বিশেষ। সে এসেই হেঁকে উঠল ছেলেটার প্রতি, এ্যাই, এ্যাই, শুয়োরের বাচ্চা, চুপ মার। নইলে—

নেশায় টলমল, জড়ানো গলা। একবার তার রক্তচক্ষু দিয়ে চেয়ে সামনে দেখল বউটা রয়েছে। বিনা বাক্য ব্যয়ে সে হঠাৎ বউটাকে ঠ্যাঙাতে আরম্ভ করল। মত্ত বলে তার জায়গা অজায়গা বলেও খেয়াল রইল না।

মার খেলেও কি মানুষের মুখের কোন ভাবান্তর হয় না। গাইগোরুও মার খেলে তার চোখে একটা ভীতভাব ফুটে ওঠে. অসহায় ঊর্দ্ধশ্বাস গতিতে ছুটতে চায় সে। কিন্তু এ মধ্যবয়সী মেয়ে মানুষটির সে বোধও নেই। সে বৃষ্টি আটকাবার মত ঘাড় পেতে. হাত তুলে খানিকক্ষণ সেই মার খেল। স্বামী মারতে মারতে যে সব কথাগুলি বলছিল, তার একবর্ণও বোঝা যাচ্ছে না। কেবল কতকগুলি গালাগাল খানিকটা স্পষ্ট। লোকটা হাঁপিয়ে উঠেছে মারতে মারতে।

বউটি তেমনি নরম এবং শান্ত গলায় বলল. হয়েছে. এবার থাম, চল ঘরে চল।

বলে সে তার স্বামীকে হাত ধরে ঘরের দিকে নিয়ে গেল। কিন্তু স্বামীর তখনো থামার নাম নেই। সে ওর মধ্যেই এক হাতে ধপাধপ পিটিয়ে চলেছে।

ঘরের রকে ফেঁসোর আলো জ্বলছিল, তার এক টুকরো আলো অন্ধকার ঘরটার এক কোণে একটু পড়েছিল। ঘরের মধ্যে মত্ত স্বামী ধপাস্ করে তার বৌকে নিয়ে মাটিতে পড়ল।

রকের উপর বসা রুগ্ন ছেলেটা অপলক জ্বলন্ত চোখে ঘরের অন্ধকার কোণটার দিকে তাকিয়েছিল। গলার শিরাগুলো তার ফুলে

উঠেছে। জিরজিরে হাড়সার শরীরটা উঠেছে শক্ত হয়ে। বুকের বাঁ দিকটা টুক টুক করে নড়ছে। সমস্ত পৃথিবীটাই এমনি দমবন্ধ করে রয়েছে কি না কে জানে। চটের ফেঁসোর জ্বলন্ত শিখাটাও অকম্পিত স্থির।

কিছুক্ষণ পরে তার মা কোমরের নেকড়াটা গুছিয়ে বেরিয়ে এল, জটপড়া মাথাটা খস্ খস্ করে চুলকোল একটু তারপর ক্ষ্যাপা ছেলেটাকে ধরে বুকের কাছে নিয়ে এল। তার জ্বলন্ত চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, এস বাপ, অত ক্ষেপছিস কেন? মরে যাবি যে!

সেই অন্ধকার কোণের দিকে তাকিয়েই ছেলে বলল, ও শালাকে আমি মেরে ফেলব।

ছি, ও যে তোর বাপ হয়।

হোক। ও তোকে মারে কেন?

আর কাকে মারবে বাবা? ওর আর বউ কোথায়, কে ওরটা খায় আর পরে? আর কার জন্য ও সারা দিন পড়ে পড়ে খাটে?

তা বলে মারবে?

মারবে। ইচ্ছে করলে খুনও করতে পারে। গাওনার সময় আমার বাপ ওকে যে দুটো বলদ দিয়েছিল, তার একটাকে ঠেঙিয়েই মেরে ফেলেছিল। আমার কানের রূপোর মাক্‌ড়ি দুটো একটা চামারনীকে দিয়ে দিয়েছিল। সেই রাক্ষুসী চামারনীটা ওকে তুক্ করেছিল। ইচ্ছে করলে আমাকেও মেরে ফেলতে পারে।

এত নির্বিকার, এত শান্ত, এত সুরহীন গলাটা মায়ের যে, ছেলেট ওই বুড়োর বেসুরো গানকে ভেংচানোর মত ভেংচে ওঠে মাকে ধাক্কা দিয়ে খাম্‌চি কেটে সরিয়ে দিতে চায়। খিঁচিয়ে ওঠে, পারে সব পারে। তোরা দূর হ আমার কাছ থেকে, দূর হ।

মা আরও মিষ্টি করে ছেলেকে কাছে টেনে বলে, ওরই জন্য তো তোদের পেয়েছি বাপ, নইলে কোথায় পেতুম। তারপর একটু চুপ থেকে মা অন্য কথা বলে, কালকেই তো তুই বড় হবি।

যাত্মমন্ত্রের মত ছেলেটার মুখভাব পরিবর্তন হয়, ক্ষ্যাপাটে ভাবটা কেটে গিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। বলে, তুই তো রোজই তাই বলিস।
হই না তো '
হবি বাবা হবি।
তবে কালকেই মাকি সায়েবের কাছে নিয়ে চল্।
আচ্ছা।
আর আমি বিলেতে গিয়ে সায়েবদের কারখানায় কাজ শিখব, বিকেলে রোজ সায়েবদের কোঠির পেছনে গঙ্গার ধারে বসে থাকব। সেই অনেক দূর গঙ্গার নৌকাগুলিকে চেঁচিয়ে ডাকব।
সেখানে কি গঙ্গা আছে?
মায়ের এ প্রশ্নে সে নির্বিকারভাবে বলল, হ্যাঁ খুব বড় গঙ্গা আছে। আর রহমত আর্দালির সঙ্গে বেশ গল্প করব।
রহমতও আছে?
সায়েব থাকলেই তো আর্দালি থাকবে?
ও!
মায়ের মুখটা যেন দূরবিসারী ঘাস বনের দিকে তাকানো এক হাঁ মুখো গোরুর মত। ছেলেটা বুঝতে পারলে না যে মায়ের চোরা দোলানিতে তার ঢুলুনি আসছে। সে মায়ের তুই স্তনের মাঝে মাথা রেখে দূরে মিলিয়ে যাওয়া সুরে হেসে বলল, মেমসায়েব বউটা যদি তোর মত ভালো হয়, তবে আমি একদম পিটব না।
মা ভাবলেশহীন মুখে ফোঁস ফোঁস করে হাসল।
তারপর যখন ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল, তখন মায়ের চোখ ত্নটোতে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে আসে ছেলের রুগ্ন শান্ত স্বপ্নভরা মুখটার দিকে চেয়ে। অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, মাকি সায়েবের বিলেত দেখা তোর আমি মলেও হবে, কিন্তু বাবা, রোগের বালাই কাটিয়ে এ শরীলটুকু তোর বড় হবে কবে?
জল পড়ছে ঝিম্ ঝিম্ করে। খুশি গলায় ডাকছে কোলা ব্যাঙ, হাট বসিয়েছে উঠোন জুড়ে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে একটানা। বস্তির

হট্টগোল শান্ত হয়েছে। ঘরে বাইরে কাঁচা মাটি ফুঁড়ে উঠছে মোটা মোটা কেঁচো, মাংস-খেকো কালো কালো ডেয়ো পিঁপড়ে এখানে সেখানে চলেছে লাইন বন্দী হয়ে। যে সব ঘরগুলোয় জল পড়ছে, সে সব ঘরের লোকেরা গালাগালি দিচ্ছে বাড়িওয়ালাকে। বাড়িওয়ালার কানে তা যাচ্ছে না। আর গেলেও বুঝি কিছু আসত যেত না। নন্দ আর হরিশ বসে আছে তেমনি।

এদিককার খাওয়ার পাট চুকে গেছে। কিন্তু কালোর এখনও খাওয়া হয়নি। কিছুক্ষণ আগে সে কোথায় বেরিয়ে গেছে। বোধ হয় তার কারখানার নতুন বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করতে গেছে। আর খেতে বাকি আছে ফুলকি।

গোবিন্দ রান্নাঘরের দরজাটা ভেজিয়ে রেখে গেল ফুলকির ঘরের দিকে, সে এসেছে কিনা তাই দেখতে। সে আর বেশীক্ষণ বসে থাকতে চায় না। খিদে পেয়েছে। কালোর ভাত বেরে নিয়ে রাখলেও হবে।

বৃষ্টির জল লেগে শির শির করে উঠছে গায়ের মধ্যে। উঠোনটায় যেন দই জমে আছে কাদার। ফুলকির ঘরের দিকে যেতে গিয়ে মনটা বারবারই থমকে যাচ্ছে গোবিন্দের। কেউ দেখে ফেললে না জানি কি ভাববে। ফুলকি যে বেওয়ারিশ!......বেওয়ারিশ। কথাটা মনে হতেই গোবিন্দের কৌতূহল বেড়ে উঠল। ফুলকির জীবনে তা হলে কি আছে, শরীরের রেখায় রেখায় অত বাহার নিয়ে কি মনে সে চলে। কালো বলেছে সে প্রেমযোগিনী। সে প্রেম-যোগিনী কেমন? সে কি ঈশ্বরের প্রণয়িনী—সন্ন্যাসিনী? তাই বা কেমন করে সম্ভব। এ জগতের কথা তো সে জানে! দুর্বিনীত পুরুষের হাত থেকে বাঁচার কি অস্ত্র থাকতে পারে ফুলকির? বিশেষ করে এই সমস্ত এলাকায় ও মহল্লায় যেখানে খলিফা ওস্তাদ সর্দারদের কুটিল ও লোলুপ দৃষ্টি থেকে কারো রেহাই নেই। বাপ সোয়ামীর আশ্রয় থেকে যেখানে মেয়ে ছিনিয়ে নেয়, সেখানে ফুলকির মত মেয়ে অমন বুক ফুলিয়ে চলে কি করে।

গোবিন্দ দেখল অন্ধকারে আর একটি মূর্তি তার আগে আগে চলছে ফুলকির ঘরের দিকে। একবার চমকে উঠল বাড়িওয়ালা ভেবে। কিন্তু না লোকটা একটু বেঁটে।····· ও! নগেন। গরিলার মত বেঁটে ও মোটা নগেন। ফুলকির ঘরের দিকে সে কেন চলেছে এমন চুপিসাড়ে? তার মনে পড়ল কালোর কথা।

গোবিন্দ যেতে না যেতেই দেখা গেল নগেন ফিরে আসছে ফুলকির দরজার অন্ধকার কোল থেকে।

জিজ্ঞেস করল গোবিন্দ, নেই?

নগেন চমকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।- কে নেই?

ফুলকি।

জবাব দিতে গিয়ে এক মুহূর্ত স্তব্ধ রইল নগেন। চাপা গলায় জবাব দিল, না। বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গোবিন্দের মুখটা দেখতে চেষ্টা করল। বলল, খুঁজছ তাকে?

হ্যাঁ, ভাত দেওয়ার জন্য।

হুঁ হুঁ করে একটা শব্দ হল নগেনের গলা দিয়ে। সেটা রাগের না বিদ্রূপের বোঝা গেল না। বলল, শালা দুনিয়ার নিয়মটাই এমনি।

কেমনি?

এই কাউকে সেধেও খাওয়ানো যায় না, কেউ চেয়েও দুটো পায় না। লিয়ে এস না বাবা সেঁটে দিই।

কারখানা বস্তির বাসিন্দা হিসাবে গোবিন্দ অনন্য। বালাইহীন ভবঘুরের জীবনে যা থাকা উচিত ছিল না, সেই ধিক্কার, সংকোচ, ভয়, লজ্জা তার অতীতের চরিত্রটার মধ্যে এখানে অনেকখানিই রয়ে গেছে। কেননা, তার যে আর একটা জীবন ছিল, দশ বছর আগের সে জীবনের চিহ্ন এখনো কিছুটা বুঝি রয়ে গেছে বুকে। সে সপ্রতিভ, হাসকুটে, গপ্পে, তার জীবনের গতির খেল্ অনেকের অনেক এলানো পালে হাওয়া লাগিয়ে আকাশে মেলে দিয়েছে, কিন্তু তার মনের কোথায় লুকিয়ে আছে অনেকখানি আড়ষ্টতা,

বিনয়, বেদনা। আবার এও সত্যি যে, তার প্রতি পদক্ষেপে আছে এক বিচিত্র দ্বিধা, নিজের কাছে নিজের দুর্বোধ্যতা আর সেই কারণে মানসিক গ্লানিরও কমতি নেই। নিজের হৃদয়ের কাছে সে ফকির হুকুমবরদার, যার কাছে যখন সে আত্মসমর্পণ করে হুকুমমত থাকে তারই হাতে। এসব মানুষের জীবনে দুঃখই সার হয়। কিন্তু তেমন দুঃখবাদী নয় গোবিন্দ, প্রাণ তার আনন্দের সন্ধান করে, ঝাঁপ দেয় দুঃখ চাপা জগদ্দল পাথরের বুকে।

নগেনের কথায় মনটায় বড় ধিক্কার লাগল তার। আবার রাগও হল। সেধে খাওয়ানোর জন্য ফুলকির সন্ধান করেছে সে সত্য, নগেন যদি খেতে আসত তাহলেও কি সে খোঁজ করত না? মন থেকে কোন স্পষ্ট জবাব এল না তার। কে জানে সে নগেন হলেও সত্যি খোঁজ করত কি না।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে নগেন বিদঘুটে গলায় হেসে উঠল বলল, লাও ঠ্যালা, মাথায় বিষ্টি লিয়ে তুমি কি সত্যি ভাবতে লাগলে নাকি? না বাবা ফোরটুয়েন্টি, আমাকে দিতে হবে না, সে ভাত যারটা তাকেই গিলিও।

গোবিন্দ হঠাৎ ক্রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল, আমাকে কি তোমার মত মাগীর পেছনে ঘোরা মানুষ ভাবো?

নগেনের মুখটাও চকিতে কঠিন হয়ে উঠল। পরমুহূর্তে হেসে বলল, ভাবলেই বা কি। কোন্ শালা না ঘোরে?

নিজের মনটাকে কিছুতেই ঠাণ্ডা রাখতে পারল না গোবিন্দ। অত্যন্ত তিক্ত গলায় বলে উঠল, তাই বেওয়ারিশ মেয়ের দরজায় রাতে ঢুঁ মারো।

তুমিও তো যাচ্ছিলে বাবা। বলে আবার হেসে উঠে বলল নগেন, কালোও শালা এমনি বড় বড় বাত্ মারত, সে শালাও দেখি লটকে পড়েছে। মগর ঢুঁঢুঁ। দেখ থোড়া কোশিশ করে। তবে অনেক জল, তল পাবে না।

গোবিন্দ দেখল গোঁয়ার নগেনের সঙ্গে তর্ক বৃথা। সে যা বুঝেছে তার

আর নড়চড় হবে না। তবু বলল, কালোর সঙ্গে তুমি কারো তুলনা করো না। তার দিল অনেক বড়।

হ্যাঁ, শালা হিজড়ের দিল তো অনেক বড়ই হবে। তবে ওদের হাতে মেয়েমানুষের পুতুলই থাকে ভালো। খেলবে আর কপাল ঠুকবে। ওসব ফুলকি টুলকির পেছনে কেন? একটা দুর্বোধ্য শব্দ করে সরে গেল সে। খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে এসে দাঁড়াল গোবিন্দের মুখোমুখি। হঠাৎ যেন কিসের জ্বালা ধরে গেছে তার মনে। বলল, ক-দিন এসেই সব বুঝে ফেলেছ না? বলছ, ফুলকি বেওয়ারিশ। তুমি আর কালো তাই ভাব, কিন্তু ফুলকি তো আমাদের। কবে সে বেওয়ারিশ ছিল? আর এখন ছুকরিটা রেণ্ডি হয়ে গেছে—কালসাপ। কী জান…কী জান তুমি?

বলতে বলতে নগেনের গলাটা চেপে এল একেবারে। তারপর হঠাৎ কেশো গলার বিদ্রূপ করে হেসে উঠে বলল, তুমি সোহাগ করে ভাত নিয়ে বেড়াচ্ছ। কিন্তু—

কি বলতে গিয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে ফিরে যেতে যেতে শোনা গেল তার চাপা গলা, শালাদের খালি বড় বড় বাত্ আর বলিহারি ধৈর্য বাবা।

হঠাৎ গুড় গুড় করে মেঘ ডেকে হাওয়ার ঝাপটা দিয়ে গেল। পাশের পাকা বাড়ির একটি জানালা চকিতে খুলে বন্ধ হয়ে গেল। উঁকি দিয়ে গেল এক ঝলক আলো।

গোবিন্দের ক্রুদ্ধ মনটা হঠাৎ অবশ হয়ে গেল যেন। নগেনের তীব্র চাপা গলার কথাগুলো শুনে তার মনে হল, সত্যি কালো ভিক্ষুকের মত দুর্বল আর অন্ধকার নিরালাতে সে বুঝি সত্যি ফুলকির কাছে যাওয়ার জন্যই মাত্র যেতে চেয়েছিল। তবু দাঁতে দাঁতে পিষে সে হিসিয়ে উঠল, শুয়োরের বাচ্চা!

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল গোবিন্দের। অন্ধকারে তাকিয়ে কিছু ঠাওর

করতে পারল না। পাশে হাত দিয়ে দেখল, কালো নেই।

ডাকল, কালো।

জবাব নেই। আবার ডাকল, কালো।

এবার জবাব এল, কি বলছ?

কোথায় যাচ্ছ এত রাতে?

কালো বলল, রাত কোথা। চারটে বাজল যে! যাই, নেয়ে টেয়ে আসি, আজ থেকে আবার কাজে যেতে হবে। বলে দরজাটা খুলে আবার সে বলল, তুমি ঘুমোও, উঠো না এখন, বুঝলে?

হুঁ। বলে গোবিন্দ চেয়েই রইল। হয়ত ঘুমিয়েই পড়ত, কিন্তু কালোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে, অন্ধকারে অবাক হয়ে সে ঘুমের ভান করে পড়ে রইল।

কিন্তু কি একটা মনে পড়তেই সে আবার উঠে পড়ল। ডাকল, কালো।

চমকে উঠল কালো। বলল, ঘুমোওনি?

না, একটা কথা মনে পড়ে গেল। গোবিন্দ উঠে ঘরের এক কোণ থেকে কি নিয়ে কালোর সামনে বাড়িয়ে দিল।

কালো বলল, কি?

গোবিন্দ বলল, ভাত।

উভয়েই তাকাল উভয়ের মুখের দিকে। কিন্তু কেউ কারো মুখ দেখতে পেল না অন্ধকারে। নিশ্চুপ, স্তব্ধ। শুধু পাশের বাড়িটার খোলা কল থেকে সমানে জল পড়ার একটা ছড়ছড় শব্দ শোনা যাচ্ছে। আর তার সঙ্গে তাল রেখে রাত্রির নৈঃশব্দে ঝিঁঝি র ডাকের মত শোনা যাচ্ছে বুড়োটে গলায় একটানা কথাহীন সুর।

কেন, কিসের ভাত, বলাটা দুজনের কাছেই এত অবান্তর মনে হল যে, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে পারল না। কেবল কালো ফিস্‌ফিস করে বলল, তুই কি শালা সত্যি ফোরটুয়েন্টি?

আমি ভগবান। বলে গোবিন্দ ধপাস্ করে আবার শুয়ে পড়ল।

নগেনের রাত্রের কথাগুলোই তার বারবার মনে পড়ছে। কেউ চেয়ে

ছুটো পায় না, কাউকে সেধেও খাওয়ানো যায় না। নগেনের কথার সেই স্থূল হুলের খোঁচা এখন তার বুকে বাজল যেন হাজার অপমানের ছুরি হয়ে। রাতভর ফুলকির ভাত নিজের এন্তেজারিতে রেখে এখন কালোর হাত দিয়ে পাঠানোর কথাটা যেন দুই থাপ্পড়ে তার মুখটা অন্ধকারে ঠেলে দিল। নগেনের বিদ্রূপ তবে মিথ্যে নয়।

কিন্তু কালোর মহব্বত!

অমনি কে যেন ধমকের স্বরে আরও তীব্র বিদ্রূপ করে উঠল গোবিন্দের বুকের মধ্যে। ভাল রে তোর বিবাগী মন। কালোর পীরিতে উথলে ওঠে তোর যে সোহাগ, সে তো বাউণ্ডুলের ভাঙ্গা মনের রং। কিন্তু এখানে সে রং এর দাম কি। গোবিন্দের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তার সেই দশ বছর আগের মানুষটা। যে কথাটা নিজের কাছেও তার স্বীকার করতে মন চায় না, সেইটাই বারবার মনে আসে। দশ বছর আগে একদিন তাকে এখান থেকে পুলিশ বার করে দিয়েছিল, বার করে দিয়েছিল এই চব্বিশ পরগণা জেলা থেকে। জেলা খারিজ করে দিয়েছিল। একলা নয়, আরও দুজনের সঙ্গে।

সেদিন সে ছিল একটা আগুনের মত মিস্তিরি ছোকরা। সব কিছু বোঝাবুঝির ধারটা কম ধারত, অল্প কথায় চটত। কারণ, কারখানায় সামান্য খোঁচা খেলেও সে ফোঁস করে ফণা তুলে ধরত। একটু কিছু হলেই, সোজা গোরাসাহেব ম্যানেজারের ঘরে ছুটে গিয়ে টেবিলের উপর ঘুষি মেরে কথা বলত। তখন সকলের কাছ থেকে সাড়া না পেলে সে একধার থেকে সবাইকে গালাগাল দিতে আরম্ভ করত, থুতু দিত, আর বলত, তোরা ভীতু, ভেড়ার দল।···যুক্তির প্রশ্ন তুলতে গেলে তো মারমুখীও হয়ে উঠেছে কোন কোন দিন। তবু এক একটা দিন গেছে, যখন তাকে সামনে রেখে ক্ষ্যাপা মানুষের দল বন্যার বেগে ছুটে গেছে ম্যানেজারের ঘরের দিকে। সবাই বলত তাকে, সেই টরন্ ঘরের ছোকরা মিস্তিরি।

কিন্তু তার বুদ্ধি ছিল না, ছিল হৃদয় আর সাহস। শিক্ষার চেয়ে বেশী

আবেগ। তার সেই আবেগভরা বুকে সে নিজেকে বড় একলা মনে করত। কেননা, তার আশেপাশে শিক্ষা বা আবেগ কোনটাই ছিল না ভাল করে কান পাতলে হয়তো বুকের অনেক তলায় আবেগের রেশ সামান্য শোনা যেত। কিন্তু সে আবেগ ভীরু। সংশয় ও অবিশ্বাসের দোলায় দুলত। সে আবেগ টেনে নিয়ে যেত শুঁড়িখানায়, জুয়ার আড্ডায়, দেবালয়ে নয়তো বেশ্যালয়ে। কোন কিছু বা কাউকে ক্ষত-বিক্ষত করার হিংস্র বাসনায় সে আবেগ কেবলি নিজের সর্বনাশ করত। সেদিন কিছু লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকও তার সঙ্গে কথা বলত। গোবিন্দকে তারা যেন কি একটা ঠাউরেছিল। তারা গোবিন্দকে মানত, যেন সে একজন মস্ত কেউ। তাকে নিয়ে শেষ ছিল না আলোচনার। কিন্তু শিক্ষিতদের প্রতি তার কেমন একটা সংশয় ছিল বরাবর। কেননা সে ভেবে উঠতে পারেনি, এদের বুদ্ধিমত্তা তাদের এ জীবনের কোন শুভপথের শরিক সত্যি হতে পারে। তারপর কারখানার কাজের মাঝে হঠাৎ বোমা পড়ার মত একদিন সেপাই এসে হাজির হল জেলা খারিজের হুকুমপত্র নিয়ে। ম্যানেজার হৃষ্ট চিত্তে অফিসে ডেকে তাকে পুলিশের হুকুমনামাটি দিয়ে বলল, ঘরের ডাক এসেছে, এবার সরে পড়।

বিস্ময়টা সকলেরই। তার ব্যাপারটাকে এতখানি বড় করে কেউ কোনদিনই ভাবতে পারেনি। সেটা যেন আচমকা ভূমিকম্পের মত একটা হঠাৎ নাড়া দিয়ে চলে গেল। কারো যেন ভাববার বা করবার কিছু অবসর ছিল না। গোবিন্দেরও না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সে যখন ছেড়ে গিয়েছিল এ জায়গা, সেদিন একটি কথা সে কারো সঙ্গে বলেনি। অসহ্য অস্থিরতা ও অভিমান তাকে বোবা করে দিয়েছিল। কি করে জানি না, এখানকার সব কিছুকে সে বড় ভালবেসে ফেলেছিল। মনে হয়েছিল, যেন নির্বিবাদে তাকে সবাই নির্বাসনে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এমন কি তাদের সেই মূঢ় আবেগেও কোন জোয়ার লাগল না।_ তারা অপরাধীর মত কোন পাপ করার মত চুপ করে রইল।

নিস্তরঙ্গ ইছামতীর খেয়া পেরিয়ে যে মুহূর্তে সে গাঁয়ের পথ ধরল, সেই মুহূর্ত থেকে একেবারে ভোলবার চেষ্টা করল তার কয়েক বছরের কারখানার জীবন।

তারপরে তো একটা বিরাট পরিবর্তন। ঘর সংসার সব হারিয়ে পথকেই সম্বল করেছিল। এখন মনটা তার হয়ে গেছে অদ্ভুত শান্ত আর অমায়িক। জাত পেশার করাত বাটালি ছেড়ে বেহালার ছড়টা ধরেনি, এই যা। ভালো মন্দর প্রশ্নটা পর্যন্ত তার কাছ থেকে থেকে অবান্তর হয়ে যায়। দশ বছর আগের সেই জীবনটা যেন মনে হয়, অন্য কোন মানুষের গল্প কথা মাত্র। মনে হয় পাগলামী। এদের কাছে আত্মগোপন করে থাকাটাই তার আজকে মহানন্দ মনে হয়।

কিন্তু পথকে নিয়ে যেমন সে চিরকাল থাকতে পারল না, বুঝি নিজের মনের অজ্ঞাতসারেই চলে এল এখানে। যেমন আপনা আপনিই সে এখানকার সমস্ত কিছুর মধ্যে জড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে ঠিক তেমনি করেই তার বুকের মধ্যে জ্বালাটা আজ বড় বেড়ে উঠল।

মনের মধ্যে তার ধিক্কার দিয়ে উঠল, ফুলকির ভাত এমনি রেখে দেওয়ার জন্য। সত্যি, ফুলকির সে কতটুকু জানে। কালোর সে আদরের প্রেমযোগিনী কিন্তু নগেনের কাছে সে কুলটা। কালো যার ভাত নিয়ে পিছে পিছে ঘোরে, তার তো তা সাজে না। সে তো কালো নয়। আর তার অধিকারই বা কতটুকু! সকলে তা মানবে কেন? নিজের প্রতি ধিক্কার তার নগেনের খালি পেটের জ্বালার কথা ভেবে। তবুও নগেনের প্রতি মনটা তার বেঁকেই রইল। সে যে তাকে মেয়েমানুষের কথা বলে অপমান করেছে! আর কালোর কথা ভাবতে গিয়ে বুকটা তার টনটনিয়ে উঠল। তার বারবার ঘর ভাঙা জীবনে যে ফুলকির কাছে সে আবার মরতে চেয়েছে, না জানি সত্যি তাকে আবার মরতেই হয়। এত সবের মধ্যে ভিড়ে পড়ার অশান্তিতে তার বিবাগী মনটা এ ক-দিনের মধ্যে তাই বারবার পালিয়ে যাবার কথা ভেবেছে।

এখনো আবার তার সেই ভাবনাটাই যেন ফিরে এল। পালাই পালাই করে উঠল মনটা।

আবার ভাবে, কোথায়, সে কোন্ ঠাঁই ? পথ আর উপোস, উপোস আর পথ। যারা নেই, তাদের জন্য পথের কাছে লুকিয়ে কান্নার কি দাম আছে ? সে তো বাউল নয়, জীবনের অভিশাপ তাকে ঘরছাড়া করেছে। তার ছেঁড়া আস্তিনের তলায় ভাঙা বুকের কোণে যে এখনো একটু রংএর দাগ লেগে আছে। কোথায় যাবে সে। জগত বড় মজার জায়গা। ছাড়ান পাবে না কেউ।

তার চোখের উপর হঠাৎ ভেসে উঠল দুলারীর সেই অপলক চাউনি। দুলারী। দুলারী নয়, দুতোর বউ। মনে পড়ল গণেশের কথা। মরণের মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য সে অন্ধগর্ভের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। গনেশের মত মানুষের জীবনেও এমনটা হয়।

সেদিনের পর সে আর গণেশের ঘরে যায়নি। যায়নি দুলারীর ওই চোখ দুটোর কথা ভেবেই। কিন্তু লক্ষ্য করেছে গণেশের চোখ জোড়া অষ্টপ্রহর তাকে অনুসরণ করছে। গোবিন্দের মনে হয়েছে হয়তো সে কিছু বলতে চায়। কিন্তু না, গণেশ কাছে এগোয় না। বাড়িওয়ালা গিয়ে তাকে শাসাচ্ছে, গালাগাল দিচ্ছে কাজে যাওয়ার জন্য। সবই যেন পাথরের উপর ঢিল ছোঁড়া।

সারা বস্তিও নির্বিকার। নির্বিকার হয়তো নয়, যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। গণেশ তাদের কাছে যেমন অসাধারণ, তেমনি অসাধারণ তার এই বউয়ের কাছে পড়ে থাকা। কিছু বলতে যাওয়াটা যেন তাদের নিজেদের কাছেই কেমন অশোভন মনে করে।

মনের সমস্ত তিক্ততাকে ফেলে সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল।

উনুন জ্বলেছে, ধোঁয়া উঠতে আরম্ভ করেছে সারা বস্তিময়। সেই সুরহীন গলার গান আরম্ভ হয়েছে। ঘরে ঘরে কাজে যাবার তাড়া। গণেশের দরজাটা ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। ভিতরে অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। সে ডাকল, গণেশ !

অন্ধকার ফুঁড়ে গণেশ এসে দাঁড়াল তার সামনে। অদ্ভুত তার

চোখের চাউনি, অপলক। যেন মৃত্যুদূতের প্রতীক্ষার অসহ্য স্তব্ধতা থেকে আচমকা উঠে এসেছে সে।

গোবিন্দ ভেবেছিল হয়তো গণেশ ঘুমিয়ে রয়েছে। কিন্তু তাকে এভাবে উঠে আসতে দেখে চমকে উঠল সে। ভালো করে তাকিয়ে দেখল, ত্বলারী ঘুমিয়ে আছে কিংবা পড়ে আছে চোখ বুজে। নিশ্বাসের ওঠানামায় শরীর নড়ছে তার। বলল, সব দিক তো মজিয়ে এনেছ আর কদ্দিন চালাবে? ঘরে না মরে, একটু খেটে মর না। কাজে টাজে যাও।

গণেশ একবার মুখ তুলল যেন কিছু বলবে। কিন্তু আবার মুখ নামিয়ে চুপ করে গেল, ফিরে তাকাল ত্বলারীর দিকে।

গোবিন্দ আবার বলল একটু বাঁকা হেসে, বেড়ে মরণের কলটি বের করেছে। শালা মহব্বত না ফাসাদ রে বাবা! পাওনাদার যে জেলে দেবে ত্ব-দিন বাদে। তখন?

তবুও গণেশ চুপ করে রইল।

অস্বস্তিতে ভরে উঠল গোবিন্দের মন। কেমন একটা জেদের বশে হঠাৎ তীব্র গলায় সে বলে উঠল, জাহান্নামে যাবে। শালা তোর মহব্বত। বাঁচবার চেষ্টা নেই, দিন রাত্তির রোগীর কাছে পড়ে আছে। তাতে কি কেউ বাঁচে। মাইহুস্ জোয়ান। নিজের গলায় যে দড়ি দেয় তাকে কে বাঁচাবে? বাড়িওয়ালার বেড়ন না খেলে তোর হবে না।

মাইহুস্ জোয়ান। গণেশের ভাঙা গলায় কথাটা যেন ভেসে এল অনেক দূর থেকে। তারপর সে গিয়ে চুপচাপ বসে পড়ল বেড়ায় হেলান দিয়ে মাথা নীচু করে।

গোবিন্দ বেরিয়ে আসতে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। গণেশকে ওই রকম ভাবে সরে গিয়ে বসে থাকতে দেখে বুকটার মধ্যে তার মোচড় দিয়ে উঠল। যেন কোন নিষ্ঠুর যাত্নকরের মন্ত্র-আচ্ছন্ন একটি জীব গণেশ। সে কাছে এসে আবার গণেশের পাশে বসে তার মুখটা তুলে ধরল। ডাকল, গণেশ।

গণেশ তার দিকে তাকাল। শক্ত পুরুষের রুক্ষ চোখে তার জল নেই, কিন্তু যেন কান্না ভরা। গোবিন্দের মনে হল, কালোর চেয়েও গণেশের বেদনা সীমাহীন। যেন সব মিলিয়ে মানুষটি শিশু হয়ে গেছে। সে বলল গণেশকে অনেকদিনের পুরানো বন্ধুর মত, কারো পরে ভরসা নেই তোর কেন? তুই না উঠলে যে শালা বউটা কেটে পড়বে। আমি বলছি, ও বাঁচবে…মাইরি। তুই তোর কাজ করগে। সব ভার ছেড়ে দে আমার পরে।

গণেশ মুখ নামিয়ে বলল অত্যন্ত নীচু আর মোটা গলায়, আমি না থাকলে ও মরে যাবে।

গোবিন্দ বলল, তোর কথায়…তোরই একটা বউ আছে, আর যেন কারো নেই, ছিলও না। লোকে তো চেষ্টা চরিত্তিও করে…বলি তোরা দুটোতে মলে এ সমসারে কার কি আসবে যাবে?

গণেশ মাথা নাড়ল: অর্থাৎ কারো কিছু আসবে যাবে না। তারপর দুলারীর দিকে একবার দেখে বলল, তুমি কেন বইবে এ ভার?

প্রশ্নটা শুনে থম্‌কে গেল গোবিন্দ। জবাবটা দিতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য ভারী অসহায় বোধ করল সে। বলল, কেন বইব? আমার এমন হলে তুমি দেখতে না?

গণেশ আঁতি পাঁতি করে কি খোঁজে গোবিন্দের মুখে।

গোবিন্দ এবার হেসে ফেলল। বলল, তোমাকে দেখেছি আর সেরেফ্ মজেছি? বলে গণেশের হাত ধরে কাছে টানল। আবার বলল, এখানে যে যার নিজেকে নিয়ে মশগুল, মন চাইলেও কেউ কাউকে দেখতে পারে না। আমি দেখব, তুমি কাজে যাও।

তারপর হঠাৎ গণেশের কাছে মুখ নিয়ে বলল, বউ না হয় তোরই, সোয়ামী না হই, তোর মত সোহাগ তা বলে খুব করতে পারব।

বলে সে হা হা করে হেসে উঠল। যেন খানিকটা জোর করে টানা হাসি।

গণেশ খানিকটা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল গোবিন্দের দিকে। খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ বলল, তোমার মত মানুষ আর দেখিনি।

গোবিন্দ বলল, আমার মত দেখেছ কিন্তু তোমার মত মানুষ আমি দেখিনি।

দুজনে তারা চুপ করে তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। গণেশের জ্বালাভরা চোখ দুটো যেন গোধূলির তারার মত করুণ হয়ে উঠল।

ফর্সা হয়ে আসছে দিন। মেঘমুক্ত আকাশ। বাইরে ছোট ছেলে-পিলেগুলোর সেই দৈনন্দিন প্রকৃতির পীড়ন শুরু হয়েছে। গলা শোনা যাচ্ছে বাড়িওয়ালার।

ঘরের অন্ধকার কেটে গিয়ে দুলারীর মূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে খাটিয়ার উপর। তার বড় বড় চোখের অপলক দৃষ্টি এদের দুজনের দিকে।

সেই দিকে আর একবার দেখে গণেশ আবার কথা বলল; সে যেন গণেশ নয়, আর কারো গলা ভেসে আসছে ধীর আবহ সংগীতের মত, দোস্ত, তোমার কোন ঠিকানা জানি না, জান্-পহচন্ নেই তবু আমার তক্‌লিফ নিতে এসেছ তুমি।···তামাম বস্তি বলছে আমি বেয়াকুব। বলে, গরীব কুলি কাবাড়ির আবার মহব্বত! ওসব লাখ্‌পতির ঘরে সাজে। রানীর ব্যামো হলে রাজা বসে থাকতে পারে না, তার আবার·····

চুপ হয়ে যায় গণেশ। তারপর হঠাৎ চাপা উত্তেজিত গলায় বলে ওঠে, ঝুটা বাত। লাখপতির জান রূপেয়া, রাজার মহব্বত সিংহাসনে, রানী তো পুতলা। এক যাবে হাজারটা কিনবে। আমি রাজা নই, একটা ফালতু আদমি। আমার তো জানের পরোয়া নেই, পরোয়া মহব্বতের। একটা আমার লাখ্‌লাখ্, গেলে যে ফকির বনে যাব!

এমনিতেই গোবিন্দর মনটা নরম। গণেশের এ কথাগুলো শুনতে শুনতে তার বুকের কোনখানটায় যেন গোপন কান্নার হাহাকার উঠল। সে বলে উঠল, তুই যে শালা আর এক রাজা, মহারাজার ব্যাটা!

গণেশ আবার কথা বলে উঠল। তার বুকটার এতদিনের গুমোট ঘরে যেন হঠাৎ হাওয়া লেগেছে। গোঁফদাড়ি ভরা মুখটা উত্তেজনায় কুঁচকে অদ্ভুত হয়ে উঠল। বলল, দোস্ত, ফাগু তাঁতীর সুতো ভালো

ছিল না, চট খারাপ দেখে সাহেব ওকে খিস্তি করে লাগালে তুই ঝাপ্পড়। ফাগু শালা চুপ। আমার জান জ্বলে গেল। মিশিন ছেড়ে ছুটে গেলাম, শালা তেরি···

বলতে বলতে তার সারা শরীর ও মুখভাবে মনে হল যেন সাহেবের গলা টিপে ধরেছে।

সবাই রুখে দিল। পালিয়ে গেল কমিনা সাহেব।······এখানে শোধ নিতে পারি। কিন্তু এই তুলারী···ও ভিন্‌জাতের ছোটঘরের মেয়ে। গাঁয়ে যখন ওকে আমার ঘরে এনে তুললাম, তখন আমাদের ঘরের মানুষেরা আর ওদের জাতের লোকেরা আমাকে এমন পিটলে যে, জান খতম মনে করে ফেলে দিয়েছিল নদীয়া কিনারে। তখন এই তুলারী আমাকে নিয়ে বনে জঙ্গলে লুকিয়ে ফিরেছে, সারা গায়ের খুন গাইবাছুরের মত চেটে চেটে তুলেছে, হাড়-গোড় ভাঙ্গা টুণ্ডাকে কোলে করে রেখেছে। আর ও আজ মরতে বসেছে, এখানে আমি কার উপরে শোধ তুলব। কার উপর? তাই ভেবেছিলাম আমিও মরব···মরব ওর সঙ্গে।

গণেশের কথা শুনে আপনা থেকেই গোবিন্দের মুখ থেকে যেন বেরিয়ে এল, সাহেব দুশমন, ব্যামো কি তোমার মিতা? ব্যামো দুটোই, তবে বকমফের। শোধ যদি তুলতে হয় তো দুটোর উপরেই তুলতে হবে।

গণেশের কোটরাগত চোখে তীব্র অনুসন্ধিৎসা, যেন অন্ধকারে কিছু হাতে ঠেকেছে, বলল, কিন্তু এযে সারতে চায় না।

সারবে কেন, বিগড়ে আছে যে! গোবিন্দ যেন কথার খেই পেয়ে খুশি হয়ে ওঠে। তাঁতী তুমি, বিম্ না চললে কি কর?

জাম ছাড়াই।

তবে জাম ছাড়াও, ও শালার চিজ গাঁটে গাঁটে দলা পাকিয়ে আছে, ওকে চেঁচে ফেল। শরীলের জাম ব্যামো, ওটাকে ছাড়াতে হবে। এর নাম ইলাজ।

তারপর হঠাৎ গলাটা যেন অকারণে ধরে এল গোবিন্দের। আচমকা

যেন টিপুনি লেগেছে অন্তরে। বলল ঢোঁক গিলে, আমাদের ক্ষ্যামতা কম, তবু হাল ছাড়ব না। হাল ছেড়ে তো অনেক ঠকেছি, আর নয়।

একটা কলাপাতার বাঁশীর মত সরু শব্দে উভয়ে তারা ছুলারীর দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ছুলারীর কঙ্কাল মুখের সে এক বিচিত্র ভাব। তার নির্নিমেষ চোখের তারা কেবল গোবিন্দ-গণেশের দিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। দ্রুত নিশ্বাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে নাকছাবি। ঠোঁট নড়ছে, আর অবিশ্বাস্য হলেও একটা অস্পষ্ট হাসির রেখা ঠোঁটের পাশে ফুটে তার সারা মুখটাকে যেন বদলে দিয়েছে।

গণেশ অমনি ঝুঁকে পড়ল ছুলারীর মুখের উপর। কান এগিয়ে দিয়ে বলল, কী বলছ, বল।

স্বরটুকু প্রায় হারিয়ে গেছে ছুলারীর। ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলল সে যেন, পরপুরুষের সামনে সোয়ামীর সঙ্গে কথা বলছে নও-বহুড়ি।

গোবিন্দ শুনতে পেল না সে কথা কিন্তু এই প্রথম দেখল গণেশের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে হাসি। কিম্ভূতাকৃতি মেঘের কোলে বিদ্যুতের মত সে হাসির গভীর রেখা তার গোঁফের পাশে ও চোখের কোলে।

হাসিটা আপনা থেকেই ছড়িয়ে পড়ল গোবিন্দের মুখে। বলল, কী বলছে?

গণেশ বলল, বলছে, তোমার কথা ঠিক। ওদের ঘড়িকলটা অমনি বিগড়ে যেত মাঝে মাঝে।

এ বুঝি কাজ করত কলে?

তবে? সল্‌তান নোকরি ওর···আর বলছে, আমাকে কারখানায় যেতে হবে।

হাঁ?

হাঁ!

ছুজনেই তারা হেসে উঠল। সে হাসি শুনে যেন আবার লজ্জা পেল

দুলারী, মরা চোখ তার হাসি ও লজ্জায় মধুর হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি চোখ বুজে গেল তার। মুহূর্ত পরে সে চোখের কোল ছাপিয়ে ঝরঝর করে ঝরে পড়ল কয়েক ফোঁটা জল। অনেক দিন পর তার রোগগন্ধপূর্ণ অন্ধকার ঘরটাতে সাড়া পড়েছে হাসির। অনেক দুর্দৈবের মধ্যেও সে শুনতে পেয়েছে গণেশের হাসি, যে হাসিটুকু তার প্রাণের চেয়েও দামী। আর গোবিন্দের মুখখানি যেন এঁটে বসে গেছে তার মনের মধ্যে। ইচ্ছে করল, গণেশের মত সেও ওকে এখুনি একবার ডেকে উঠবে, দোস্ত ?···ভাবতে সরমও লাগে। ও যেন তার ফাটা সানাইয়ে ওস্তাদ বাজনদারের মত সুরের ঢেউ তুলে দিয়েছে।

গোবিন্দের হাত ধরে গণেশ বলল, দোস্ত, আমি তবে দৌড়ই হাজিরা দিতে ?

গোবিন্দ বলল, দিল ঠুকে বেরিয়ে পড়, সব ভার আমার। তুমি শুধু ওকে বাইরে চালার ছায়ায় শুইয়ে দিয়ে যাও।

হঠাৎ একটা খিল্‌খিল্‌ হাসির শব্দে গোবিন্দ ফিরে দেখল, বাইরে বাড়িওয়ালা একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে চোখ ঘোঁচ করে আর কাঁসর ফাটানো হাসিতে দুলে দুলে উঠছে ফুলকি তার পাশে।

বাইরে আসতে দেখা গেল অনেকেই নিজেদের মধ্যে নানান কথা জুড়ে দিয়েছে। কাজে বেরুবার পূর্ব মুহূর্তে মানুষগুলো যেন উপভোগ করছে একটু মজা।

ফুলকি ভ্রূ তুলে কটাক্ষ করে বলে উঠল, শুধু ফোরটুয়েন্টি লও তুমি আরও তুক ফুঁক জানা আছে দেখছি তোমার।

গোবিন্দ বলল, তুমি তো ফুঁক তুকের বাইরে, তোমার তবে ভাবনা কি ?

বাইরে কি গো! বস্তির মধ্যে এমন সব্বনেশে মানুষ থাকলে কি আর রক্ষে আছে ? বলে সে আবার হেসে উঠল।

সে হাসিকে স্তব্ধ করে দিয়ে নগেন অট্টহাসি হেসে উঠল প্রায় নাটকীয়ভাবে।

গোবিন্দ ভাবল নগেনের এ হাসির খোঁচা তারই প্রতি। এদিকে ফুলকির মুখের হাসিটুকু যেন দুরন্ত ঝড়ের বেগে ঝরে গেল শুকনো পাতার মত।

বাড়িওয়ালা জিজ্ঞেস করল গোবিন্দকে, সাধুগিরি করতে নাকি আগে?

করতাম না, এখন থেকে করব। জবাব দিল গোবিন্দ।

লোমশ পেটটাকে ঘোঁচ করে, চোখ দুটোকে আরও খানিকটা ভ্রূর তলায় ঢুকিয়ে বলল বাড়িওয়ালা, হুঁ! কথার রাজা আমার!......

তোমার সঙ্গে আমার দুটো কথা আছে! চল।

তারা দুজন চলে যেতেই, ফুল্‌কি সকলের দিকে একবার দেখে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল সেখান থেকে।

তার চলে যাওয়ার ভঙ্গি দেখে কয়েকজন আবার হেসে উঠল।

তার গলায় শোনা গেল, কিন্তু যা-ই বল, ওই ফোরটুয়েন্টিওয়ালার কোন মতলব আছে। কেননা, ও শালা বড় ভালমানুষি দেখায়।

হাঁ, ভালমানুষ মানেই ছেলে খাবার যম। কে আর একজন বলে উঠল।

একলিকে লম্বা মানুষ একটা প্রায় ঘুষি বাগিয়ে উঠোনের মাঝখানে এসে সরু গলায় চেঁচিয়ে উঠল, শালা বেশী ওস্তাদি করলে হাঁকব একদিন কোঁতকা···যাতে দুনিয়ার ভালমানুষগুলো সব শালা খতম হয়ে যায়। নগেন বলে উঠল তার স্বাভাবিক গলায়।

কথাটা তার এমন দ্ব্যর্থব্যঞ্জক যে কোঁতকা হাঁক্‌নেওয়ালা লোকটা আর একবার আস্ফালন করে উঠতে গিয়ে হঠাৎ থম্‌কে মাড়িয়ে ফেলল এক গাদা ময়লা।

অমনি সবাই হো হো করে হেসে উঠল। মাদারি খেলোয়াড় তার ডুগডুগিটা বাজিয়ে দিয়ে বলল, দ্যাটাজ কোল্ মাদারি-কা-খেল্।

অমনি ইংরেজী সে মাঝে মাঝে বলে থাকে।

ময়লা মাড়িয়ে ফেলা লোকটা তার সরু গলায় ফাটা বাঁশীর মত চিৎকার করে উঠল, কোন্ গিদ্‌ধরের বাচ্চা এখানে এ কাজ করেছে,

আমি জানতে চাই। যেন সে-ই এ বস্তির মালিক। কিন্তু তার ফল ফলল সাংঘাতিক। বাচ্চাদের মায়েরা ছিল, তারা সব একসঙ্গে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর, সে গিদ্ধরের বাচ্চা তোর বাপ, তোর চোদ্দ পুরুষ রে গেছো ভূতের বাচ্চা!

লিকলিকে লম্বা লোকটা প্রায় আঁতকে উঠে, ময়লা মাড়ানো ঠ্যাংটা তুলে, এক পায়েই ছুট দিল পোঁ পোঁ করে, যেন বাচ্চাদের এক্কা-দোক্কা খেলার দৌড়।

হাসিতে চিৎকারে ডুগডুগির শব্দে সে এক অদ্ভুত ব্যাপার সারা বস্তিময়। কেবল নগেন, যে কালকে রাতেও গোবিন্দকে কটূক্তি করেছে, সে আপন মনে বিড়বিড় করে উঠল, লোকটা শালা সত্যি ফোরটুয়েন্টি করে দিচ্ছে।

বাড়িওয়ালা গাঁজায় দুটো লম্বা টান দিয়ে, কলকেটা বাড়িয়ে দিল গোবিন্দের হাতে। তারপর কয়েক মুহূর্ত ভোম্ হয়ে থেকে গম্ভীর গলায় বলল, দেখ ফোরটুয়েন্টি, একটা ভারী ফ্যাসাদে পড়ে গেছি। মনে হয়, তোমার খানিক বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, একটা মতলব দিতে পার?

গোবিন্দ প্রমাদ গণল। লোকটা এখুনি বোধ হয় পাকা বাড়ি তোলার পরামর্শ চাইবে। বলল, এখন যে আমার উনুনে আগুন দিতে হবে?

সেটা একটু বাদে দিও। বলে বাড়িওয়ালা একবাব ভালো করে দেখে নিল গোবিন্দের মুখটা। বলল, দেখ, আমার জমিটা আগের আইনের গুণে ঠিকা থেকে মৌরস হয়ে গেছল, তখন ছিল অন্য জমিদার। এর পরে যে জমিদারটা এল সে শালা আসলে ছিঁচকে বেনে। গুড় বেচে বড়লোক হয়েছে। সে ব্যাটা নতুন আইনের প্যাঁচে ফের ঠিকে বানিয়ে দশ বছরের মেয়াদী করে দিয়েছে। এখন কি করা যায়?

গোবিন্দ ব্যাপারটা আগেই শুনেছিল। কিন্তু এতখানি জানত না। জিজ্ঞেস করল, এ নয়া জমিদার কি তোমার খাজনা বাড়িয়েছিল?
হাঁ।
তুমি বাড়তি খাজনা দিয়েছিলে?
হাঁ।
হাঁ? গোবিন্দ অবাক হয়ে গেল। কেন দিলে?
বাড়িওয়ালা বোকার মত বলল, চাইলে যে!
হতাশায় মাথা নেড়ে বলল গোবিন্দ, তবে তো ল্যাঠা চুকেই গেছে। এবার পাত্‌তাড়ি গুটোও। বাড়তি খাজনা যখনি দিলে, তখনি তো তুমি ফের ঠিকে মেয়াদ মেনে নিলে, তা জানো না?
বাড়িওয়ালা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। গোবিন্দ বিদ্রূপে হেসে বলল, শালা এমন মানুষও জগতে আছে। উল্টে এট্টা নালিশও তো করতে পারতে?
তাতে কি হত?
কী না হত? আগের দলিল দেখিয়েই তো তুমি মৌরুসীপাট্টা পেতে। হাজার কেননা জমিদার বদল হোক্, ওদের আইনেই পেরজার ভোগ দখল কেউ নষ্ট করতে পারে না!
কিন্তু ওদের আইনেই তো এটা হল।
সে তো তুমি বোকা পেরজা বলে। এখনকার যে রাজা, পেরজা তার থেকে এক কাঠি সরেস না হয়েছে তো মরেছে। এও জানো না?
কিন্তু—
কিন্তু টিন্তু ছাড়। তোমার মেয়াদ আর কতদিন?
বছর খানেক মাত্র।
হতাশা ভরে মাথা ঝেঁকে বলল গোবিন্দ, ও! খালি ছিলিমে দম্ দিচ্ছিলে অ্যাদ্দিন? শিগ্‌গির তোমার দলিল পত্তর নিয়ে একটা ভালো উকিল ধর।
তা হলে আমি কি করব?
বাড়িওয়ালার এ দারুণ অসহায় গলার স্বরে অবাক হয়ে গেল

গোবিন্দ। লোকটাকে দেখে মনে হল তার, এ সেই বাড়িওয়ালাই নয়। কোথায় সেই ভ্রূকুটি পাথুরে কাঠিন্য আর বিদ্রূপ ভরা ভারিক্কী চাল।

এ যেন আর কেউ, চালচুলোহীন একটা অত্যন্ত সাধারণ ভালমানুষ বলতে যা বোঝায়। দুটো শান্ত চোখে উদ্বেগ, মোটা ভ্রূতে দুশ্চিন্তার রেখা।

গোঁফ জোড়া যেন ধ্বসে পড়েছে।

এরা তো আসলে আমার, মানে···পেরজাই, কি বল? আর, সত্যি, আমি এদের রামের মতই পালন করতে চাই। মানে ঠিক বাপের মত।

অন্য সময় হলে গোবিন্দ হয়তো হাসিতে ফেটে পড়ত। কিন্তু বাড়িওয়ালার স্বপ্নাচ্ছন্ন মুখটার দিকে তাকিয়ে সহসা তার মুখে কোন কথাই যোগাল না।

ভক্তিতে ভাগবৎ পাঠের মত অপূর্ব গম্ভীর আর ব্যথিত সুরে ভরে উঠল তার গলা, ফোরটুয়েন্টি, ভালো মানুষ আমার কাছে যে আসবে, তাকে আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে রক্ষা করব, সমস্ত তকলিফ নেব। এখানে যে একবার এসেছে, সে আর কখনো আমাকে ছেড়ে যেতে পারেনি। কেন? না আমি ওদের রাজার মত পালন করি। দেখ, ওই গণেশকে এ এলাকার কোন বাড়িওয়ালা ঘর দেয় না। পুলিসের বড়বাবু আমাকে কতদিন শাসিয়েছে গণেশকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে, আমি ওসব থোড়াই কেয়ার করি। গণেশকে আমি বুঝেছি, ও যা-ই হোক্, একটা খাঁটি ছোক্‌রা। বস্তি হোক্ আর ভাগাড় হোক্, এটা আমার রাজ্য, এখানে আমার যাকে খুশি রাখব। কি বল?

গোবিন্দ বলল, কিন্তু, এরা তো তোমাকে ভাড়া না দিয়ে ঠকায়?

উত্তেজনায় স্ফীত হয়ে উঠল বাড়িওয়ালার মুখ, তুমি একটা সত্যি ভবঘুরে উজবুক। ওদের একটা নেড়ি বিল্লিও ঠকিয়ে মুখের রুটি খেয়ে ফেলে। ওরা ঠকাবে আমাকে? তা যদি জানত ওরা, তাহলে বিষে বিষ মরত। এক ভাঁড় তাড়ি খেয়ে ওরা পেটটাকে চোখ ঠারে।

বলতে বলতে তার গলাটা সরু হয়ে এল, চোখের দৃষ্টি হারিয়ে গেল অসীম শূন্যে। দু-হাতে মুঠো করে টেনে ধরল বুকের বড় বড় চুলের গোছা। ফোরটুয়েন্টি, তোরা সবাই অষ্টপহর দুঃখের কথা প্যাঁচাল পাড়িস্ নিজের কথা বলতে আমার মন চায় না। তবু বলি, মানুষের পেটে জন্মে আমি ছিলাম যেন কখনো ধোবীর গাধা কখনো ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়ার মত। না মা, না বাপ। কিন্তু পুরনো কথা বলে কী লাভ! নিজের কথা ভেবেই ওদের উপর আমি জুলুম করিনে ভাড়ার জন্যে। এটা ওদেরই রাজ্যি, ওরা এটাকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে। তবে আমি কেন? না, নিমিত্ত। খাঁটি রাজার এ-ই চাল। তা বলে বেতমিজি করলে কি আর শাসন করব না? দরকার হলে ঠ্যাঙাব, ঠিক বাপের মত। কিন্তু বস্তির মালিকদের মত জানে মারব না। ওদের ট্যাঁকের পয়সা চুরি করব না, যে পয়সা ওদের জান।

বলে সে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, শুনি, এ সন্‌সারের তিন ভাগই জলে ডোবা। সে জল আমাদের দুখ তক্‌লিফের দরিয়া, আর ডাঙাটুকু যেন সুখের কলিজা। কিন্তু, আজ কোথায় এসে ঠেকেছি··· নিজেই জানি না। বলে সে তার লাল চোখ দুটো হাত চাপা দিয়ে বসে রইল।

নির্বাক গোবিন্দ কলকে হাতে হাঁ করে তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে। মনে হল, ডাঙা নয়, সর্বনেশে চোরাবালির কিনারে এসে ঠেকেছে লোকটা। বাড়িওয়ালা তার নিজের কথা কিছুই বলল না, কেন না ওর জীবনের দুঃখ দরিয়ার ঢেউ বুঝি কোন মানুষ সইতে পারবে না। কিন্তু গোবিন্দের বুদ্ধির সীমা থাকলেও এটা সে বুঝেছে, ভাবনায়, চিন্তায়, জীবনের ব্যয়ে জমায় মানুষটা সবছাড়া সবহারা একটা মস্ত মহৎ, কিন্তু একেবারে যেন ব্যর্থ। এ সংসারের আইনে ওর সবটাই পাগলামি! সদীবুড়ির কাছে ওর জীবনের অনেকখানি সে শুনেছে। জমিদারের উৎপীড়ন, সাধুদের কুৎসিত নির্যাতন। আসলে এ পাগলামিটা ওর বুকের লুকোনো মস্ত ঘা-টার

উপর হয়তো নিয়ত মলমের প্রলেপের মত ; কিংবা বলতে হয়, দারুণ বিদ্বেষে, সব কিছুর সঙ্গে নিজের জীবনটাকেই লোকটা বাজী রেখে বসে আছে। এত বড় শরীরটা নিয়ে লোকটা বসে আছে, সেটা কিছুই নয়। শুধু একটা পাহাড় যেন। পাথরের ভিতরে কি কথা আছে, কে জানে সে কথা!

বাড়িওয়ালা আবার তেমনি অসহায়ের মত কথা বলে উঠল, কিন্তু যাদের জন্য এসব ভাবি, তারা সব একটি মহা ছ্যাঁচড়া, বেতমিজ। ওদের মগজে কিছু নেই। ফোরটুয়েন্টি, তোমার কথামত আমি একটা আখেরি চানোস্ নেব, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। দেখি শালা একবার দেওতার মারটা।

হাসতে হাসতে কান্নার মত একটা দোভাবা যন্ত্রণায় ভরে উঠেছে গোবিন্দের বুকটা। সে কি বলবে, ভেবে পেল না। লোকটা তার নিজের কাছে এত খাঁটি যে, ওকে কিছুই বলা যায় না।

শহরের অভ্যন্তরে, বস্তি-মালিকদের মহলে সে একটা বিচিত্র মানুষ। সমস্ত শহরটাই একটা বস্তি-শহর। এখানে যারা কর্তা ব্যক্তি, তারা সকলেই বস্তির মালিক। অর্থাৎ বাড়িওয়ালা। একজন বাড়িওয়ালা মানে, সে দোকানদার সুদখোর আর কারখানা মালিকদের বন্ধু, সংবাদদাতা। কারখানার মালিক অসুবিধা বুঝলে, বাড়িওয়ালাদের শরণাপন্ন হয়। একমাত্র বাড়িওয়ালারাই নাকি এখানকার অবুঝ কুলিকামিন মজুরওয়ালিকে বোঝাতে সায়েস্তা করতে পারে।

সেদিক থেকে এ বাড়িওয়ালা শুধু ভিন্নরকম নয়। একেবারে উল্টো মানুষ। এখানকার বাড়িওয়ালারা অবাক হয়, যখন শোনে, সে ভাড়া পর্যন্ত মকুব করে দেয় বাসিন্দারের। তা'ছাড়া কম বেশী সকলেই তার এ বিচিত্র রামরাজত্বের আদর্শের কথা শুনেছে। সেজন্য বাড়িওয়ালা মহলে তাকে নিয়ে সব অদ্ভুত আলোচনা হয়। কেউ বলে, পাগল, কেউ সাধু, কিংবা কোন ডাকাতদলের সর্দার। বহু বিশেষণ তার আছে। আর সব বাড়িওয়ালাদেরই তার উপর একটা জাতক্রোধ আছে। তাদের যেসব বাসিন্দারের তারা ভাড়া

না পেয়ে বে-ইজ্জত করে, তাড়িয়ে দেয় তারা সবাই এসে জোটে এ বস্তিতে। সবাই মিলে মতলব ভাজে, কি করে ওকে জব্দ করা যায়, বিপদে ফেলা যায়। ওৎ পেতে আছে সকলেই। তা'ছাড়া লোকটি যত না বিচিত্র, সকলে গল্প ক'রে ক'রে তাকে রহস্যময় করে তুলেছে আরো বেশী। সেজন্য অনেকে তাকে ভয়ও করে। তার গোঁয়ার্তুমির খ্যাতি বেশ আছে বাইরে।

তাকে ঘাঁটাতে সাহস করে একমাত্র বিরিজামোহন। এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বস্তি-লাইন ওর, ডাকসাঁইটে বাড়িওয়ালা। সমস্ত বাড়িওয়ালাদের সর্দার বলা যায় তাকে। সবাই তাকে খাতির করে, সেরা আসনে বসতে দেয়। দিয়ে, তার পাশে বসে লোককে দেখিয়ে হাঁটু নেড়ে নেড়ে তৃপ্তি পায়। অর্থাৎ বিরিজামোহনের মত সেও একজন বাড়িওয়ালা। বিরিজামোহন তার বন্ধু। বিরিজামোহন থানার বড়বাবুর বন্ধু, এখানকার বাঙ্গালী জমিদারের বন্ধু। সাহেবদের ক্লাবের নাচঘরে যায়, গিয়ে উল্লুকের মত নাকি বসে থাকে। মাতাল সাহেবরা তাকে পিঠ চাপড়ায়। সে মোটা চাঁদা দেয়, মেঘনাদদেবের গয়নাও গড়িয়ে দেয়। চারটে সোনার দোকান আছে তার। সমস্ত অঞ্চল জুড়ে তার পান বিড়ি থেকে সব রকমের ব্যবসা আছে। যেখানে বিরিজামোহন, সেখানেই সেলাম। কোন বাড়িওয়ালা ভাড়াটে নিয়ে একটু মুশকিলে পড়লে পরমর্শদাতা সে-ই। তার নাকি একটা গুপ্ত দল আছে। খুনে-দল তার নাম। তার বস্তির বাসিন্দারের ধন-মান ইজ্জতের সে-ই মালিক। ভাড়া আদায় না হলে হাজতবাস, ঠ্যাঙ্গানি। একটু সেয়ানা ভাড়াটে হলে তার হাড়মাস কালি। শোনা গেছে, দু'একজনকে নিজের হাতে খুন করেছে সে। নেশা ভাং-এ সিদ্ধ হস্ত।

নয়াসড়কের এ বস্তি-জমির যে বাঙ্গালী জমিদার, তার সঙ্গে খুব খাতির। এ জমিটা নিজে কেনবার জন্য ফন্দি আঁটছে সে দিবানিশি। প্রয়োজন হয়তো ছিল না ততখানি, কিন্তু এখানে একমাত্র নয়া-সড়কের বস্তির বাড়িওয়ালা আর তার বাসিন্দারা তাকে সেলাম

করে না। তা'ছাড়া জায়গাটাও খুব ভাল।

কিন্তু এদিকে বিরিজামোহন খুব ভদ্রলোক। লোকের সঙ্গে সামনা-সামনি ঝগড়া করতে কেউ দেখেনি তাকে। সামনে সে অমায়িক ও শান্ত। কাজ করে তলে তলে। সে আসে প্রায়ই নয়াসড়কের বস্তিতে, হালচালটা জেনে নিতে। বাড়িওয়ালার নাম করে সে বলে, 'ওকে মাঝে মাঝে খুঁচিয়ে না এলে আমার সুখ হয় না।' কথাটা সে মিছে বলে না। কেননা এ বাড়িওয়ালার চরিত্রের কতগুলি দিক সে ভাল জানে। লোকটা কিসে বিরক্ত হয়, যন্ত্রণা পায়।

সেদিনও এল বিরিজামোহন। বাড়িওয়ালা গল্প করছিল গোবিন্দর সঙ্গে বসে। বিরিজামোহনকে দেখেই সটান হয়ে বসল সে। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, ফোরটুয়েন্টি, চট্ করে সরে বোস্। বিরিজামোহন শালা আসছে! ওর সামনে তুই আমাকে হুজুর বলে ডাকবি। মানে, ওর সামনে ডাঁট দেখাতে হবে কিনা! নইলে মুখের উপর টিটকারি দেবে খচ্চরটা।

আচমকা বিস্ময়ের ঝোঁকটা কাটিয়ে ওঠবার আগেই গোবিন্দ দেখল বিরিজামোহন আসছে এদিকেই। রোগা, বেঁটে, ফর্সা লোকটা কাছে আসতে দেখা গেল জরি-পাড় কাঁচির ধুতি পরেছে ফুলকোঁচা দিয়ে, হাঁটু অবধি ঝুলে পড়েছে ফিনফিনে আদ্দির কলিদার পাঞ্জাবী, মাথায় দেশী টুপি, পায়ে বুটিদার নাগরা। লোকটার মুখের চামড়া যেন অকালেই ঝুলে পড়েছে। কুত্‌কুতে দুটো চোখের তীক্ষ্ণ শিকারীর দৃষ্টিতে যেন সে আগে পাছে কেবলই শিকার খুঁজছে। ঠোঁটের কোণে ও ওই চোখে তার একটা ছলনার নোংরা হাসি জ্বল্‌জ্বল্ করছে। লোকটাকে গোবিন্দ আরও একদিন দেখেছে। সেদিন লোকটার একটা কথারও জবাব দেয়নি বাড়িওয়ালা। খানিকক্ষণ বকে বকে আপনিই চলে গিয়েছিল। ওর উপস্থিতির কারণই হল, বাড়িওয়ালাকে খানিকটা অপদস্থ করা।

বিরিজামোহন বাড়িওয়ালাকে বলল, জয় রামজী বাবু সাহেব, খবর

সব ভালো ?

বাড়িওয়ালা ইতিমধ্যেই তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা রুক্ষ গাম্ভীর্যের মুখোশে ঢেকে ফেলেছে নিজেকে। পা দুটো মাটি থেকে তুলে, পা ছড়িয়ে খাটিয়ায় বসে সে আগে বলল গোবিন্দকে, এক ছিলিম বানাও। গোবিন্দ বলল, জী হুজুর।

তারপর লোকটার দিকে ফিরে বলল, জয় রামজী। আসুন, তছরিফ্ রাখুন। কিন্তু তছরিফ্ রাখবার আর খাটিয়া ছিল না। বসতে হলে মাটিতে বসতে হয়। লোকটা দাঁড়িয়ে থেকেই বাঁধানো দাঁত দেখিয়ে বলল, আপনি বসলেই আমার বসা বাবুসাহেব, তাতে আর কি হয়েছে। বলে লোকটা এক চোখ বুজে একটা ইঙ্গিত করল এদিকে চেয়ে থাকা গোবিন্দকে। তারপর পকেট থেকে একটা রাংতার মোড়ক খুলে বাড়িয়ে ধরল বাটা সিদ্ধির সুগন্ধি গুলি।—আসুন বাবু-সাহেব। মহাদেবের পেসাদ।

বাড়িওয়ালা বলল, ওসব চলে না। আমি মহাদেবের অন্য পেসাদ খাই, সেটা খেলে আপনার কলিজা ফেটে যাবে।

বিরিজামোহন খুকখুক করে হেসে একটা গুলি কোঁত করে গিলে ফেলল। বলল, শত হলেও আপনি একটা মালিক আদমি, আপনাকে ছাড়া আর কাকে নেশার চিজ্ দিই! অর্থাৎ বাড়ি-ওয়ালাকে বস্তির মালিক বলে সে উপহাস করছে। বলে আবার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে এগিয়ে দিল, আপনার মেহেরবাণী ?

গোঁফজোড়া মুচড়ে দিয়ে বলল বাড়িওয়ালা. ঠকানো পয়সায় নেশা আমি করিনে।

আপনি কিসের পয়সায় নেশা করেন ?

নিজের পয়সায়।

বিরিজামোহন আবার হেসে উঠে একটা সিগারেট ধরাল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, সত্যি, একটা কথা শুনে আর না এসে পারলাম না। শত হলেও আপনি আমার একই পেশার লোক। বস্তিটা তো

উঠে যাচ্ছে, এবার আপনি কি করবেন বাবুসাহেব?

নিষ্ঠুর হাসিতে বেঁকে উঠল তার ঠোঁট।

বাড়িওয়ালার গলায় আস্তে আস্তে তিক্ততার ঝাঁজ মিশতে আরম্ভ করেছে। সে বলল, চোরের আর আমার পেশা এক নয়। আর আমার বস্তি উঠে যাবার কোন কথা আমি জানিনে।

বিরিজামোহন সেই একঘেয়ে বিদ্রূপের সুরেই বলল, জমিদারের কাছে শুনলাম, মেয়াদ খতম হয়ে গেছে?

আমি শুনিনি।

তবে শুনুন--

কোন দালালির দরকার নেই। বলে বাড়িওয়ালা গোবিন্দের হাত থেকে গাঁজার কলকেটা তুলে নিল।

কিন্তু বিরিজামোহন দমবার পাত্র নয়। বলল, তাহলে আপনার পাকা মোকামের প্যালেনটা কদ্দূর হল?

বাড়িওয়ালা এবার হঠাৎ খাটিয়া থেকে পা নামিয়ে বলল নির্মম গলায়, কোন ঠগ্ জুয়াচোরকে আমি তা বলতে চাইনে।

মুহূর্তের জন্য একটু থমকালো লোকটা। হঠাৎ ঐ প্রসঙ্গ ছেড়ে গোবিন্দকে বলল, তোকে যেন চিনি মনে হয়।

গোবিন্দ যেন এরকম একটা জিজ্ঞাসাই প্রত্যাশা করছিল। কেননা, দশ বছর আগে লোকটা তাকে বিলক্ষণ চিনত।

কিন্তু তার আগেই বাড়িওয়ালা চাপা গলায় প্রায় গর্জে উঠল, কোন শালার ওকে চেনার দরকার নেই।

ধ্বক্ করে জ্বলে উঠল লোকটার চোখ দুটো। একবার বাড়িওয়ালা ও গোবিন্দকে দেখে হঠাৎ পেছন ফিরে, সামনে ঝুঁকে লোকটা কুঁজোর মত দুলে চলে গেল।

খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, দাঁড়া গুণ্ডামি তোর বেরুবে। ডাকাত বস্তি তোর ভাঙল বলে।

বাড়িওয়ালাও চেঁচিয়ে উঠল, তোর বাপের বস্তিরে শালা!

কিন্তু গোবিন্দ জানত, বিরিজামোহন আবার আসবে, অমায়িক হাসবে

আর থেকে থেকে এমনি বার বার হুল ফুটিয়ে নিষ্ঠুর আনন্দে চোখ কোঁচকাবে।

দাঁতে দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল বাড়িওয়ালা, শুয়োরের বাচ্চা!

গোবিন্দকে বলল, দেখলে, কি রকম পেছনে লাগতে আসে শালারা। জান শালার টিকটিকির মত, টিপুনি দিলে অক্কা পেয়ে যাবে।

বলে গাঁজার কলকেটা বাগিয়ে ধরে টানতে গিয়ে আবার থেমে বলল, ওদের কাছে ডাঁট দেখাতে হয় সব সময়। মানে, আমি তো বাড়িওয়ালা কিনা, ওদের কাছে সেটা সব সময় দেখাতে হয়। নইলে ওকে আমি কুত্তা বলেও ডাকি না।

গোবিন্দ আর কিছুতেই চোখ তুলে তাকাতে পারল না বাড়িওয়ালার দিকে। মানুষটার পাগলামির কথা সে যত ভাবল, তত যেন গুমরে উঠতে লাগল তার বুকটা। সে তাড়াতাড়ি ভেতরে যাওয়ার সেই গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কলকেটা আর টানা হল না বাড়িওয়ালার। গোবিন্দ চলে যাওয়ার পথের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল তার। দু-হাতে গলাটা চেপে ধরল এমন ভাবে, যেন ভেতর থেকে কোন ঠেলে আসা জিনিসকে রোধ করছে। তবু এ নিষ্ঠুরদর্শন মানুষটার লাল চোখ দুটো ভিজে উঠল যেন। ফিস্‌ফিস্ করে বারবার বলতে লাগল, আমি ফকির···একটা ফকির।···

ওরে সব ছেড়ে ফকির হয়ে ছুটেছি তোর পেছনে,
দেখি, আমারে না ধরা দিয়ে পালাস কেমনে।

জলদে গান ধরেছে আবেগভরে সেই বুড়োটে গম্ভীর গলা।

আকাশে মেঘ ফকির বেশে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে দেশান্তরে। পেছন টান নেই, বাঁকাবাঁকি নেই ডাইনে বাঁয়ে। তবু মাঝে মাঝে থমকে যেতে হয়, হাওয়া না থাকলে।

কেটে গেছে আষাঢ়ের ঘটা, ধারা বয়ে গেছে শ্রাবণের, পচানি মজেছে ভাদরের, গুমসোনি কাটছে আশ্বিনের। হেমন্ত আসে আসে। আকাশের নীলে তার ঝক্‌মকানি।

ভর দুপুরে, বি টি রোড থেকে নিউ কর্ড রোডের মাঝে রাবিশ ফেলা রাস্তাটা যেন ঝিম মেরে পড়ে আছে। তার ধারে বস্তিটা পড়ে আছে যেন মুখ গুঁজে জবুথবু হয়ে। নতুন খুঁটি বিবর্ণ হয়েছে, ঘুণ ধরেছে পুরনো বাঁশে। শ্যাওলা জমেছে খোলার চালায়, খানিক খানিক লালচে আভা কোথাও। খোলার আসল রং ওই লাল। এখনো একটু একটু বজায় রয়েছে যেন ভাঙা মনে রং-এর ছোঁয়ার মত। ফকিরের ঘরের চালা যে!

পাকা বাড়িটার পেছনের জানালা দিয়ে ফেলা কুটনোর অবশিষ্ট, কাগজের টুকরো, ন্যাকড়ার ফালি আরও কত কি পড়ে পড়ে চালার একটা জায়গা খানিকটা ঢিবি মত হয়ে উঠেছে।

গঙ্গার তীর থেকে ভেসে আসা কারখানার একটানা শব্দের সঙ্গে, কর্ড রোডের ঝোপের ছায়াবাসী ঘু ঘু-র ঘুক্ ঘূক্ তাল যেন মন্দীভূত করে দিয়েছে দিনের গতিকে।

গোবিন্দ হাসছে রান্নাঘরের রকে বসে বসে। হঠাৎ মনে হয় হাসছে না, বুঝি হাসির ছলে কাঁদছে। বন্দী হয়েছে ফকির। মুক্তি তার আসেনি, বুঝি নিজেও ভুলে গেছে মুক্তির কথা। আজ আর সে মুক্তি চায় না। মহাবন্ধন তাকে জড়িয়ে ধরেছে আষ্টেপৃষ্ঠে।

সে হাসছে ওই রুগ্ন ছেলেটার দিকে চেয়ে। মাকি সাহেবের সঙ্গে বিলেত যাত্রার আগে সে পেয়েছে ফোরটুয়েন্টি চাচাকে। গোবিন্দ আজ সব বাচ্চাদের ফোরটুয়েন্টি চাচা হয়েছে। সমস্ত বস্তিটা আজ ফোরটুয়েন্টি বলতে অজ্ঞান। মেয়েরাও ইস্তক তাকে সঙ্গী করে নিয়েছে। সকলের সব কিছুতে আছে সে। গণেশ আর দুলারীর সে দোস্ত। প্রাণের বন্ধু। দুলারীও আরোগ্যের পথে। মাদারির সে ফেরেশ্তা। কেবল তার সঙ্গে কথা বলে না নগেন। দুরন্ত অভিমানে বুক পুড়ে গেছে কালোর। সে হদিস হারিয়েছে ফোরটুয়েন্টির বিচিত্র মনের। গোবিন্দ আর ফুলকির ভাত রেখে দেয় না সে আজকাল। কালো নিয়ে রেখে দেয় নিজের এন্তেজারিতে। কিন্তু গোবিন্দ আসলে নিজেকে বন্দী করেছে অন্যত্র। তার পরিচয়

আজ মহল্লায় মহল্লায়, এলাকায় এলাকায়। বিশেষ এই বস্তির মামলাটা কেন্দ্র করেই গোবিন্দ আজ ছড়িয়ে পড়েছে। সে আজ আর সে মানুষটি নেই। সে বাইরে যেতে শুরু করেছে, আলাপ জমাতে আরম্ভ করেছে দশ বছর আগের সেই ছেড়ে যাওয়া দোস্ত. ইয়ারদের সঙ্গে।

লাগে না লাগে না করেও গোবিন্দের ঝিমিয়ে পড়া পালে হাওয়া লেগে গেছে। একটা অদ্ভুত পরিবেশ গড়ে উঠেছে তার চারপাশে। এ মানুষটির মাথায় বস্তির সব ভার চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে বাড়িওয়ালা। গোবিন্দও যেন এ কাজটি পেয়ে বেঁচেছে। এ জন্য তার ছুটোছুটির শেষ নেই, অন্ত নেই ভাবনার। আর যাই হোক্ সে বুঝেছে শুধু মাত্র বাড়িওয়ালার স্বার্থরক্ষার জন্যই তার এত মাথা ব্যথা নয়। অনেকের অনেক দুর্দশা জমা রয়েছে এর মধ্যে।

জমিদার ও এ-বস্তির বিরুদ্ধ পক্ষরা যখন সবাই এটার উচ্ছন্ন যাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিন্ত, ঠিক সে সময়েই এ মামলার খবরটা একটা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। সে সঙ্গেই রটনা হয়ে গেছে, কে এক ফোরটুয়েন্টি নামধারী এসব করছে। কেননা ওই পাগলা বাড়িওয়ালার তো কোন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। বিশেষ এ বস্তিরই অনেকের এ রকম একটা বিশ্বাস আছে।

কথাটা ছড়িয়েছে নানান রকম ভাবে। বিরুদ্ধ পক্ষ বিরিজামোহনের দলের শেষ নেই ভাবনার আর কৌতূহলের। কেউ বলছে, ফোরটুয়েন্টি একটা বাহাদুর ছোকরা। আসলে ছোকরা বাড়িওয়ালারই ছেলে, মুলুক থেকে এসেছে। কেউ বলছে, সে একটা লেখাপড়া জানা মহা দিগগজ, নইলে এ রকম মামলাটা চালাচ্ছে কি করে। আবার কেউ বলছে, ও একটা জেল পালানো দাগী, ওইখানে এসে ঠাঁই নিয়েছে, কেউ বা একেবারে সাধু-সজ্জন বলেও চালিয়ে দিয়েছে।

একটা অদ্ভুত রহস্যের মত ফোরটুয়েন্টি নামটার জন্যই আরও নানান্‌খানা রটেছে। বিশেষ বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরা তাকে চিনে উঠতে পারছে না। আর এ বস্তির মানুষগুলো সুযোগ বুঝে এমন

সব কথা বাইরে রটিয়ে আসে যে, তাদের ফোরটুয়েন্টি একটা না জানি কী। এ মানুষটা যেন তাদের এক মস্ত গৌরব। গৌরববোধের জন্যই হয়তো রং মেশাবার আর হিসেব নেই। এ মামলায় হার হোক্ আর জিত হোক্, জমিদার যে কিছুটা থমকে গেছে এ নিশ্চিন্ত বিশ্বাস সবাইকে খুশি করে তুলেছে। তারা বেশ বুক ঠুকেই বাইরে বলে আসে, জমিদারের থোঁতা মুখ ভোঁতা হতে আর বেশী দেরি নেই। অন্যান্য বস্তির মালিকরা রীতিমত প্রচার শুরু করেছে, মাঠের ধারে বস্তির একটা চোর ডাকাতদের আস্তানা হয়ে উঠেছে। এ এলাকায় সমস্ত গাঁটকাটাদের ওটাই হল আড্ডাখানা।

এরই মাঝে তবু গোবিন্দ কয়েকবার পালিয়ে যাবার কথা ভেবেছে। কিন্তু তার আর কোন সম্ভাবনা ছিল না। সেই ওস্তাদ মিস্তিরি ছোকরা আজ অন্য পথে মেলে দিয়েছে নিজেকে। তার বেগটাও কম নয়। এই তো সেদিন এল, এরই মধ্যে সব জুটল বন্ধু, শত্রু গজাতেও রইল না বাকি। পুরনো পরিচয়ের সূত্র ধরে সে তার লেখাপড়া জানা বাবু বন্ধুদের কাছে গিয়েছে পরামর্শের জন্য, একটু সমঝে দেওয়ার জন্য। তাছাড়া গণেশ তার পরিসর আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

দিনে দিনে, কোন্ ফাঁকে যে গোবিন্দ এ বস্তির সমস্ত কিছুর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে তা বুঝি নিজেও জানে না। এখানকার দৈনন্দিন ঝগড়া বিবাদের সালিশী বল, বিচার বল গোবিন্দ না হলে জমে না। বিশেষ বাড়িওয়ালা ও গণেশের মত লোক যাকে বেয়াৎ করে, তাকে কি কখনো ছাড়িয়ে যাওয়া যায়।

কত সময় কত খবর আসে। এ মামলাটার জন্য প্রায়ই শাসানি আসে গোবিন্দের প্রতি। কখনো মারধোরের শাসানি, কখনো জেল অথবা খুন।

কিন্তু গোবিন্দ বুঝি এটাকে গ্রহণ করেছে প্রাণের মূল্যেই।

এখানে আর সব কিছুর মধ্যে এ ব্যাপারটা তার ফাঁকা জীবনের অনেকখানি ভরে দিয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হয়, না, ভরেনি,

ফাঁকের মুখটা যেন আরও বড় হয়ে গেছে। দিবানিশি এ শূন্য জীবনের জ্বালা যে কি দিয়ে ভরাট করবে, তা ভেবে পায় না।
তার চেহারাটা অনেকখানি ভেঙে গেছে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি কেমন অসহায়, অনুসন্ধিৎসু, দিশেহারা। সে যেন কী চায়!·· কী চায়? তা বুঝি নিজেই জানে না। শুধু একটি মুখ বারবার ভেসে ওঠে চোখের সামনে, আর ধিক্কারে ও লজ্জায় যেন মাথা নুয়ে আসে। সে মুখ মনে করে তার মত পুরুষের বুকেও যেন নিশ্বাস আটকে আসে।
জীবনের এ ফাঁকটা নিয়েই সে অষ্টপ্রহর এর ওর ঘরে ঢোকে, তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়, বাচ্চাদের কোলে করে রাখে, ফাই ফরমাস খাটে প্রায় সকলের।
এখন যে সে হাসছে রুগ্ন ছেলেটার দিকে তাকিয়ে, তা যেন নির্ধন দরিদ্রের ধন পাওয়ার হাসি।
ওই যে নর্দমার ধারে কুন্দ ফুলের অপূর্ব সতেজ দুটি গুচ্ছ ফুটে রয়েছে, ওই গাছটি এনে পুঁতে দিয়েছিল গোবিন্দ। ছেলেটি ফুল বড় ভালবাসে। কিন্তু ফুল ফোটাব কোন আশা ছিল না। কেননা, গাছটার উপর দৌরাত্ম্য তো কম হয়নি। ঘরে উঠতে গিয়ে অনেক সময় পায়ের তলায় চেপটে গেছে, ঘরের আর দুটো বাচ্চা তো একটি সবুজ পাতা গজাতে দেখলেই টুক্ করে ছিঁড়ে ফেলে।
এখন ছেলেটি সদা সতর্ক প্রহরীর মত সারাদিন বসে থাকে রকের ধারে ফুল গাছটার কাছে। একটা সুতো দিয়ে বেঁধে দিয়েছে গাছটার গোড়ায় তার ফোরটুয়েন্টি চাচা। ছেলেটা হাতে ধরে রাখে সুতো। চলৎশক্তিহীন বলে সে নামতে পারে না, অথচ নাগালও পায় না। তা ছাড়া কেউ ছুঁলেই টের পায়, যেন বৈদ্যুতিক শক্ লাগার মত। এই এবড়োখেবড়ো উঠোনে, মেয়েদের কুড়িয়ে আনা গোবর, ছাই ঝাড়া কয়লা, ঘেঁস এখানে সেখানে স্তূপীকৃত। মাটি চটা ছিঁটে বেড়া, বড় বড় ইঁদুরের গর্ত, জটিবুড়ির জলের মত খানে খানে ঝুল বেয়ে পড়েছে খোলার চালার গা থেকে।
তার মাঝে এ ফুলের গুচ্ছ দুটো যেন উড়ে এসে জুড়ে বসার মত

একেবারে বেমানান।

ছেলেটার আহার নিদ্রা ভুলিয়েছে ওই ফুল দুটো, আজ ক-দিন ধরে এ ফুলের সঙ্গে কোথায় যেন মাকি সাহেবের সঙ্গে বিলেত যাওয়ার সুখী ভবিষ্যতের যোগসূত্র আছে। শরীরটা তার আরও ভেঙে গেছে, গায়ের রংটা হলদে সবুজে মিলে নীল হয়ে উঠেছে। সমস্ত আয়ুটুকু এসে ঠেকেছে যেন চোখ দুটোতে। সেই চোখে অনুক্ষণ বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে সে তাকিয়ে আছে ফুল দুটোর দিকে। কারাপ্রাচীরের মত এর ঘরের বেষ্টনী পেরিয়ে দৈবাৎ যখন একটু হাওয়া নেমে আসে উঠোনে তখন একটু গন্ধ পাওয়ার জন্য নাকের পাটা ফুলিয়ে বুকের হাড় কাঁপিয়ে নিশ্বাস টানে।

মধুলোভী ভোমরা আসে গুন্‌গুন্‌ করে তার সাত জন্মেও না আসা এ হতকুচ্ছিত জায়গায়।

বস্তির এ দুপুরের নৈঃশব্দ্যের সেই বুড়োটে গম্ভীর গলা নিজের সুরে বিভোর হয়ে গেছে। সে গানের পর গান গেয়ে চলেছে এক নাগাড়ে।

সম্‌সারেতে বাঁধা মন তোর, খুঁটোয় বাঁধা বলদ রে।
চোখে ঠুলি, গলায় দড়ি মনিষ্যি কাল কাটালি রে॥

এ একঘেয়ে গলার গান ছেলেটাকে আজ যেন আর ছুঁতে পারছে না। সে তার আপন মনে সুতো ধরে টানে। নড়েচড়ে ওঠে গাছটা। সেও আপন মনে দুলে দুলে হাসে আর কি যেন বলে ফিসফিস করে। গাছটা যেন তার সঙ্গী হয়ে গেছে।

মুহূর্তের জন্য সব ভুলে গোবিন্দও দুলতে আরম্ভ করে তার সঙ্গে। তার রোগা মুখে অদ্ভুত হাসি।

তার মধ্যবয়সী মা কাঁচা রকে শুয়ে আছে একেবারে খালি গায়ে। পাশে ঘুমন্ত পড়ে আছে আর দুটো বাচ্চা বেজির মত গায়ের রঙ নিয়ে। হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়েছে এমনি ভাবে ছেলেটা ডাকল, মা রে, মা! মায়ের কোন সাড়া নেই।

ছেলেটা আপন মনেই কতগুলো অদ্ভুত দুর্বোধ্য ভাষা বলে উঠল।

গাছটার দিকে তাকিয়ে একটু সলজ্জ হেসে বলল, ইন্‌জিরি কথা বললাম।

সুতোতে একটা টান দিয়ে বলে, বিলেত যাবার সময় তোকেও নিয়ে যাব। ভোঁস্‌…ভোঁস্‌…কল্‌কল্‌…জাহাজটা এমনি করে যাবে। সমুন্দুরের ঢেউ কি, আরে বাপ্‌রে! ডাকে কি রকম, ঐ…আ…ঐ …আ। রহমত চাচা বলেছে।…আর সেখানে গঙ্গার ধারে মাকি সায়েবের বাগানে তোর মত অনেক আছে, তাদের সঙ্গে তোকে রেখে দেব। ওই গাছগুলো তো সব মেম গাছ, তোর সঙ্গে বেশ বে হবে।

বলে সে হেসে উঠল যেন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে। তারপর মায়ের পাশে কাত হয়ে একটা খোলা স্তন মুঠো করে ধরে ঠোঁটে নাকে চোখে ঘষতে লাগল আর ওঁক ওঠার মত করে যেন গলার শির টেনে চাপতে লাগল একটা বমির বেগ। এক একটা বেগ চাপতে গিয়ে পেটটা খোঁচ হয়ে পাঁজরের হাড়গুলো বনমানুষের হঠাৎ দাঁত খিচোনোর মত বেরিয়ে পড়ছে। থেকে থেকে তার এমনি হয়। তারপর আপনিই ঘুমে ঢলে পড়ে।

তাতে তার মায়ের কোন ব্যাঘাত হল না ঘুমের। দাঁত বের করে সে তেমনি ঘুমিয়ে রইল। বোধ হয় তার ছেলের বিলেতে গিয়ে মিস্তিরি হওয়ার স্বপ্ন দেখছিল।

হঠাৎ হাওয়ায় শিউরে উঠল কিশোরী কুন্দ গাছটা। এক ঝলক হালকা মিঠে গন্ধ কোথায় উধাও হয়ে গেল হাওয়ার সঙ্গে।

দুলারী হাসছে আড়ে আড়ে, টিপে টিপে। বস্তির বাইরের রকে বসে হাসছে। ওই কুন্দ ফুলের মতই তাজা হয়ে উঠছে সে। রং লাগছে আবার তার শরীরের রেখায় রেখায়, কঙ্কালের গায়ে লেগেছে মাংস। সেরে উঠেছে দুলারী।

কাছে বসে তার দিকে চেয়ে হাসছে গোবিন্দ। খানিকটা বোকাটে বিমুগ্ধতায় আচ্ছন্ন তার মুখ। বিগলিত চোখে জিজ্ঞাসা…কিন্তু শরীরটা তার ভেঙে পড়েছে অনেকখানি।

দুপুর গড়ায়। রাবিশ ফেলা রাস্তাটায় কতগুলো ছোট ছোট ছেলে

মেয়ে কি সব কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সামনের ফালি মাঠটাতে ঝগড়া লেগে গেছে শালিকদের।

ছুলারী আজ নতুন হয়েছে। সদী বুড়ি আজ নিজের হাতে তাকে নাইয়ে দিয়েছে গঙ্গার মাটি ঘষে, সারা গা সরষের তেল দিয়ে লেপে মুছে দিয়েছে, চুবচুবে মাথা আঁচড়ে দিয়েছে পাট করে। কপালে দিয়েছে মেটে সিঁদুরের তেল গোলা টিপ, কাজলের রেখা টেনে দিয়েছে চোখে। কানের বিলিতি রূপোর মাকড়ি, কঙ্কন, পায়ের বাঁকমল ছাই দিয়ে মেজে দিয়েছে ঝকঝকে করে। অনেক দিন বাদে নিজের হাতে হলুদ রং-এর শাড়ী পরেছে নাভির তলা দিয়ে আঁট করে বেঁধে, বিনা কোঁচে, দোভাঁজে নির্ভাজ করে করে, যেমন করে সে কারখানায় যেত। কঙ্কালের সে মস্ত বড় বড় অসহ্য তীব্র চোখে আজ সলাজ হাসি, চোখের তারায় নতুন আলো।

গোবিন্দ বলল, কি, মিছে বললুম বুঝি?

ছুলারী বলল, হট্! তোমার খালি দিল্লাগী।

বাঃ রঙ্গ করলে তোমরা, দিল্লাগী হল আমার?

ছুলারী এবার খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। যেন রনরনিয়ে উঠল থম ধরা বস্তি। চমকে উঠল ঝগড়া ব্যস্ত শালিকের দল। বলল, আমি তো পড়েছিলাম বেমারিতে, রঙ্গ তো করেছে তোমার দোস্ত্।

গোবিন্দ গালে হাত দিয়ে বলল, বোঝো তা'লে, অমন একটা মানুষকে কি মজানটাই তুমি মজিয়েছ। তবে ব্যাপারটা আমি বুঝেছি।

কী বুঝেছ? ঠোঁট টিপে তাকায় ছুলারী গোবিন্দের দিকে।

সে আর তোমাকে কি বলব দোস্তানি। গোবিন্দও এবার আড় চোখে তাকায়। বলে, আমি ছুতোর শালাই মজে গেছি।

হায় রাম···হায় রাম! বলে হাসিতে ঢলে পড়ে ছুলারী। বলে, কেন, কেন?

গোবিন্দ বলে অপাঙ্গে তাকিয়ে, অমন যার রূপের বাহার!······

হাসতে হাসতে বার বার আঁচলের ঝাপটা মারে ছুলারী গোবিন্দের গায়ে মাথায়, তুমি কী বেহায়া!

কিন্তু বেশীক্ষণ হাসতে পারে না দুলারী। অল্পেতেই হাঁপিয়ে ওঠে, কাশি পায়। চোখ বুজে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, আচ্ছা, কেন এমন হয়? তোমার দোস্ত্ কি পাগল?

গোবিন্দ বলল, তা সে একরকমের পাগলই। ওরা যেটাকে ধরে, তার একটা গতি না করে সোয়াস্তি পায় না। ক্ষ্যাপা কি না! দেখলে না, আমাকে যেদিন ওর প্রাণের কথা বললে, সেদিনে কী জোশ্। আসলে ওকে যারা ভালবাসে, তাদের সকলের জন্যই ও জান দিতে পারে। তাই তো বল্‌ছি, তোমরা দুজনেই আমাকে মজিয়েছ। কিন্তু দোস্তানি, এ ক্ষ্যাপামি নিয়ে সংসার চলে না।

দুলারী ত্রাসভরে বলে, তাই তো বলি দোস্ত্, কী তুক্ তোমার জানা আছে বল। এ সারা বস্তির তামাম মেয়ে পুরুষ ওকে ঘরের বার করতে পারেনি। ও বলত, শালা পয়সাতেও কুলিয়ে উঠতে পারিনে, ব্যামোও ছাড়ে না, কোন্‌দিন এসে দেখব, মরে পড়ে আছ। আর বেরুব না। আমার তো কোন তাগদ নেই। বাড়িওয়ালাকে থোড়া বহুত মানত, সেও হার মেনে গেল। আমি মরতে পারি, মগর ওর জান যাবে, তাই ভেবে আমার মরণেও সুখ ছিল না। দোস্ত্…তুমি সেদিনে না এলে…

গোবিন্দ লাফ দিয়ে উঠে পড়ল।

দুলারী ছোট মেয়ের মত প্রায় আব্দার করে উঠল, যেও না।

গোবিন্দ কোমরে হাত দিয়ে বলল, বলবে তো যে, আমি একটা দেওতা?

না, তুমি সব। বলতে গিয়ে গলায় স্বর গভীর হয়ে আসে, চোখে ঘনায় ছায়া। বলে, আদমির কাছে সরম করি, তুমি সেটুকুও যে লুটে নিয়েছ।

হাসতে গিয়ে কেমন বেকুব বনে যায় গোবিন্দ। খানিকক্ষণ থম্ ধরে থেকে তারপর হঠাৎ হেসে ওঠে হো হো করে। বলে, তোমার খালি এক কথা।

এক কথা কেন? বেমারিতে তুমি যা করেছ, তা বুঝি মা-বাপও

পারে না।

শুনেও গোবিন্দ কথা বলতে পারে না। তার বুকের মধ্যে যেন শিশুর দুর্বোধ্য কলকলানি, তাও শব্দহীন কথাহারা।

দুজনেই তারা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর আচমকা একটা নিশ্বাস ফেলে দুলারী বলে ওঠে, ক্ষ্যাপা!

কে?

তোমার দোস্ত্।—বলতে বলতে তার মুখ থমথমিয়ে ওঠে, হাসি চোখে ফোটে দুশ্চিন্তা। বলে, ছাঁটাই আসছে আবার, দোস্ত্ তোমার ফের ক্ষেপে যাবে।

ক্ষেপবে কেন? খিলাফ লড়বে।

তা লড়ুক। মগর, আমি কারখানায় থাকলে ওকে নজরে রাখতে পারি।

চিরকাল তোমার নজরে তো থাকবে না।

না থাকুক। যদ্দিন জিন্দা আছি, তদ্দিনই রাখব। দালালরা ওকে কত দফে মারার চেষ্টা করেছে, পারেনি আমার জন্যে।

সাথীরা তো আছে।

সাথীরা কতক্ষণ। যার হুঁশ নেই, সাথীরাই বা তার কি করবে বল?

সত্যি, ছাঁটাই যেন চটকলে শরৎকালের মেঘের মত। কখন আসবে কখন যাবে আর কি তার কারণ বুঝতে না পেরে যেমন হঠাৎ ফ্যাসাদে বিব্রত মানুষে জানোয়ারে ছুটোছুটি আরম্ভ করে, ছাঁটাইয়ের আচমকা মারটাও আসে তেমনি।

গোবিন্দ বলে, তাই তো বলছি দোস্তানি, এ প্রাণ সুখ চায়, শান্তি চায়, দিলঠাসা মহব্বত, কিন্তু জীবনের এক ধান্দাই যে সব শেষ করে দিয়েছে। সাঁতরে যদি না ডাঙায় উঠতে পারি, হাঁটব কোথা?

দুলারী বলে, সচ···মগর দিল যে মানে না দোস্ত্!

দিল মানে না। গোবিন্দের মুখটা হঠাৎ কি রকম হয়ে যায়, একটা রুদ্ধ যন্ত্রণায় যেন তার মুখ স্ফীত হয়ে ওঠে। ওই একটি কথা জীবনের আর সব কিছুকে যেন মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ করে দিতে পারে।

দিল মানে না।

চকিতে যেন আকাশের বুকে মেশা দিগন্তবিসারী পথ তাকে আবার বিবাগীর বেশে ডাক দেয়। জীবনের এত ধান্দার পোড় খেয়ে আজ আবার হঠাৎ সব দিকে হৃৎপিণ্ড ক্ষইতে শুরু করেছে। বেপরোয়া প্রাণের আবার এত জড়াজড়ি না মানামানি কেন? আবার যেন মনটা পালাই পালাই করে।

পরমুহূর্তেই মনে হয়, পথেও যদি আবার প্রাণ না মানে। না মেনে তো চলে এল একবার। বেসরম প্রাণ!

বেসরম বৈ কি! নইলে আজ আবার কেন ছুতোর বউ ঘোমটা তুলে ইশারা করে, চোখে ভেসে ওঠে দরাজ উঠোনে মাটি মেখে খেলা করে নাদুস নুদুস ছেলেমেয়ে, দু-হাত যেন তাদের সাপটে ধরতে চায় খালি বুকে।

দুলারীকে অবাক করে দিয়ে সে ভিতরে গিয়ে যে মুহূর্তে জল আনার টিনের বাঁকটা কাঁধে তোলে সেই মুহূর্তে গ্লানি ও বিরক্তিতে মনে হয় বাঁকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায় কোথাও।

আজকাল তার এ কাজকে মনে হয় যেন একটা বিরাট অকাজের বোঝা। কাজের পটু হাতে যেন পুতুল খেলা। আবার কারখানার কাজ ধরবার জন্য হাঁসফাঁস করে তার মন। শুধু তাই নয়। কারখানার কাজের শেষে ফিরে আসবে সে তার ঘরে। ঘরে থাকবে···

গণেশ-দুলারীর যুগল মূর্তি ভেসে ওঠে তার চোখে। অমনি অপরিসীম লজ্জায় ভরে ওঠে তার বুক।

গোবিন্দ অবাক করেছে নিজেকে। অথচ তার এ মনই একদিন চেয়েছে, হেলাফেলায় কাটুক এ জীবন, মানুষের সঙ্গে থেকে, দশ-জনের মাঝে তাদের ফাইফরমাস খেটে, তাদের সুখ দুঃখের ওঠা নামায় দিন যাক কেটে।

কিন্তু সেদিন আজ বিস্বাদ হয়ে গেছে। এ জীবনে যেন কোন টান নেই, রং নেই, একেবারে পান্‌সে।

যে সুখ-দুঃখকে সে জীবনের পেছনে ফেলে রাখতে চেয়েছিল, বুঝি

সেই সুখ-দুঃখ আজ আবার নতুন চেহারায় এসে দাঁড়িয়েছে।

মানুষ তার নিজের মনটাকে চিনতে পারে কতখানি। নিজের সঙ্গে যার বোঝাপড়া শেষ হয়নি, জগতের সঙ্গে তার বোঝাপড়া শেষ হবে কেমন করে। জগত বিচিত্র, কিন্তু মানুষের মন আরও বিচিত্র। বাঁকটা কাঁধে নিয়ে বেরুতে যাবে গোবিন্দ, এমন সময় আবার এসে দাঁড়াল দুলারী। মুখ তার গম্ভীর, থম্ থম্ করছে। সে এসে দাঁড়াল একেবারে গোবিন্দের কাছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল তার মুখের দিকে।

গোবিন্দ অপ্রতিভের মত হেসে বলল, কি হল?

পরিষ্কার গলায় বলল দুলারী, বহুত কুছ। তোমার দিল ঠাসা আছে কিসে, কভি তা বলতে চাও না। ভাব, আমি কিছু সমঝি না। বল, কেন তুমি এমনি চলে এলে।

গোবিন্দ কাষ্ঠ হাসিতে খানিকক্ষণ হা হা করে তার স্বাভাবিক ঠাট্টার সুরে গেয়ে উঠল :

রঙ্গ করা স্বভাব যে মোর,
স্বভাব যায় না মলে,
যতই কেন বল না গো,
ইল্লত যায় না ধুলে।

তোমার সঙ্গে রঙ্গ করেছি।

এ কী রঙ্গ। তোমার মুখ হর বখত্ দুখ-আন্ধার।

দুলারীর নিশ্বাস লাগে গোবিন্দের গায়ে। গোবিন্দের চোখ বুজে আসে। আজ আর তাকানো যায় না দুলারীর দিকে। তার ভরা শরীর, নতুন পোশাক, উষ্ণ নিশ্বাস।

কান্নারুদ্ধ গলায় বলে দুলারী, বলতে, আমার ব্যামো সেরে গেলেই তুমি খুশি। সেরেছি। আজ কি দুখ্ তোমার, বল আমাকে।

কি দুঃখ, সত্যি, কি দুঃখ গোবিন্দের? রোগা মুখে তেমনি হাসির ঝলক ফুটিয়ে সে জবাব দিল, দোস্তানি দুঃখের কি শেষ আছে? শেষ নেই। পথ ছাড়, কলে ভাঁজা লাগাতে হবে। অনেক কাজ রয়েছে।

আর একবারও দুলারীর দিকে না তাকিয়ে হন্ হন্ করে চলে

গেল। কিন্তু বেরোবার গলির অন্ধকারে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দেওয়াল সেঁটে, যেন লুকিয়ে পড়েছে সে প্রাণঘাতী আততায়ীর ভয়ে। দু-হাতে মুখটা চেপে যেন অসহ্য ক্রোধে হিসিয়ে উঠল, এ শালা কিসে ফেঁসেছি আমি—কিসে?

কেবল দুলারীর কাজল টানা চোখে ভিড় করে আসে মেঘ।

আজকাল সে সবাইকে খেতে দিতে গিয়ে মাঝে মাঝে খেঁকিয়ে খিঁচিয়ে ওঠে, বিরক্তিতে হঠাৎ গালাগাল দিয়েও ওঠে। সেদিন হঠাৎ ঝগড়া লেগে গেল কি কারণে গোবিন্দের সঙ্গে সবাইকে খেতে দিতে গিয়ে।

যার সঙ্গে ঝগড়া লেগেছে, যত না চেঁচায় সে, তত চেঁচিয়ে খিস্তি করে গোবিন্দ। সবাই অবাক হয়ে দেখে গোবিন্দকে! তার এমন ঝগড়াটে মূর্তি আর কোনদিন কেউ দেখেনি।

বাড়িওয়ালা হাঁকল, ফোরটুয়েন্টি!

কে কার কথা শোনে। তেমনি চেঁচাচ্ছে, শালা চোখ দিয়ে দেখে খা, কী দিয়েছি। বেশী বলবি তো ঝাড়ব রদ্দা।

কিন্তু রদ্দা ঝাড়াঝাড়ির আগেই বাড়িওয়ালা এসে গোবিন্দকে ধরে টেনে নিয়ে গেল রান্নাঘরের মধ্যে। বলল, জায়গার ব্যামো ধরেছে দেখ্‌ছি।

গোবিন্দ ফুঁসে উঠল, তা মানুষের মেজাজ সব সময় ঠিক থাকে না, যা-ই বল।

কিন্তু আগে তো তুই এমন ছিলি না। স্নেহভরে বলল, শালা কী হয়েছে তোর?

কোন জবাব দেয় না গোবিন্দ। ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ বাড়িওয়ালা বলে, মামলাটা বুঝি ফেঁসে যাচ্ছে? তাই তোর মেজাজ—

এবার গোবিন্দ হেসে উঠল তার স্বাভাবিক গলায়। এই সেরেছে। শালা দুনিয়ায় যে যার ভাবনা নিয়ে আছে। কে বললে তোমাকে এ কথা!

বাড়িওয়ালা তাড়াতাড়ি বলে, না, কেউ না। তোর গোমড়া মুখ দেখে তাই ভাবি। তোর কি হয়েছে বল্ তো?

তোমার মাথা। বিরিজমোহন শালা এসে খচিয়ে গেছে বুঝি?

অমনি বাড়িওয়ালাও ক্ষ্যাপাটে গলায় বলে ওঠে, হ্যাঁ খচ্চরটা এসে আজ আমাকে বলে কি, তোমার ফোরটুয়েন্টিকে একবার দেখাও। হাঁকতুম শালাকে এক কোঁতকা—

তারপর শালা আর এট্টা মামলায় ফেঁসে জেলে যেতে, বলে, হা হা করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল গোবিন্দ।

কোন কোনদিন দেখা যায় গণেশ অসম্ভব চেঁচামেচি শুরু করেছে কিংবা হঠাৎ দুলারীর ওই আধা রুগ্ন শরীরের উপরেই কষিয়েছে কয়েক ঘা। সেই তারই দুলারী বউ। সব সময় গণেশ তার পরিবেশের ঊর্ধ্বে নয়। কোন কোনদিন বেধড়ক নেশা করে আসে। তা ছাড়া দুলারীরও এ বস্তিবন্দী মনটা আজকাল একটু খিটখিটে থাকে। বিশেষ করে দুরন্ত গণেশের বাইরের গতিবিধি তার ধরাছোঁয়ার বাইরে বলেই আরও দুশ্চিন্তায় মেজাজ তার বিগড়ে থাকে!

এ খিটিমিটির সময় গণেশ চেঁচিয়ে গোবিন্দকে ডাকে, দোস্ত্… ইধার আও।

গোবিন্দ গিয়ে দাঁড়ায় হেসে, কি হয়েছে?

গণেশ সোজা বলে দুলারীকে দেখিয়ে, একে বাঁচিয়ে তুমি ভারী ফ্যাসাদ করেছ।

গোবিন্দ বলে, হ্যাঁ, তাই তো। কি বলেছে?

গণেশের গোঁফ জোড়া যেন শজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে ওঠে, এ উল্লুক অওরত আমাকে বলে কি না, হরতাল কমিটির কাজে তুমি এখন যানা-আনা কম কর, আমি আগে কলে যাই. তারপর ওসব হবে। সমঝো! ওর জন্যে আমি বসে থাকব?

গোবিন্দ কিছু বলার আগেই দুলারী সাপিনীর মত হিসিয়ে ওঠে। তার জলভরা চোখে ক্রোধ আর মুখের উপর এলিয়ে পড়া চুলে

সে এক অপূর্ব রূপ। বলে, বলব, আমি লাখো বার বলব, তাতে ও মারার কে? আমার বেমারির টাইমে ও কেন ওর ওই খেঁচো মুখ নিয়ে ঘরে পড়েছিল বল? কোন্ অওরত আছে যার ভাবনা না হয়। একবার তেরো দিন হাজত হল, আমার নাওয়া খাওয়া নেই, সারা দিন হাজতের কাছে পড়ে থেকেছি। এসব পরেশানি কার?

গণেশও চেঁচায়, কারো ভাবতে হবে না। ফের বললে, মারব রদ্দা—মার না, মার। দুলারী পেছোয় না। বলে, গায়ে তাগদ থাকলে একবার দেখতাম।

তা ঠিক। দুলারী যখন সুস্থ ছিল, তখন গণেশের এরকম হঠাৎ ক্ষ্যাপামির দিনে—যখন দুলারীকে মারতে যেত, তখন সে এমন ছুটোছুটি করত যে, সারা বস্তিময় একটা হুল্লোড় পড়ে যেত তারপর আচমকা দুলারী উধাও হত। তখন গণেশ ঘরে ঘরে জিজ্ঞেস করত, দুলারী আছে এখানে?

সবাই বলত, না। আর ব্যাপারটাকে বেশ উপভোগ করত। কিন্তু এখন দুলারী সেটা পারে না।

তা ছাড়া এখন গোবিন্দকে পেয়ে ব্যাপারটার রং বদলেছে আজকাল। গোবিন্দ বলে গম্ভীর হয়ে, দেখ দু-পক্ষেই জবাব আছে। তবে দোস্তানির এ আব্দারটা খুবই অন্যায্য।

দোস্তানির মুখ অমনি দুর্জয় অভিমানে থম্‌থমিয়ে ওঠে।

পরমুহূর্তেই গোবিন্দ কঠিন গলায় বলে, গণেশ, তুই শালা আমাকে দোস্ত্, বলিস্‌নে। বলি তোর দারু খাওয়া আর বউ ঠ্যাঙানোর কথাটা কি জানে হরতাল কমিটি?

জবাব দিতে গিয়ে গণেশ হাঁ হয়ে যায়। চুপসে যায় একেবারে গোঁফ জোড়া। চুপ করে থাকে সে।

গোবিন্দ বলে, জানে না তা'লে। আচ্ছা, ঠিক আছে।

গণেশ চোখ পিটপিট করে ডাকে, দোস্ত্।

ফের ওই নাম? ধমকে ওঠে গোবিন্দ।

গণেশ গোবিন্দের হাতটা ধরে বলে, ক-জন সাথী মিলে পিলিয়ে দিয়েছে।

ছুলারী গালে জলের দাগ নিয়ে বিদ্রূপে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, ওকে খালি পিলিয়ে দেয়। পয়সা সবার সস্তা।

গণেশ তবু বলে, সচ বল্‌ছি দোস্ত্‌, দলে পড়ে ঝট্‌সে পিয়ে নিয়েছি। ···আর নয়, কোনদিন আর যাব না।

গোবিন্দ জানত, এ ব্যাপারটাতে গণেশকে জোর দেওয়া মানে অন্য রকম করা। এটা ছুলারীর কাজ আসলে। সে আরও তীব্র গলায় বলে, দোস্তানির গায়ে তোর হাতটা তো আর কেউ তুলে দেয়নিরে শালা! বলেছি না, অওরতের গায়ে যে হাত তোলে সে নীচের সঙ্গে আমি মিশিনে।

গণেশ চুপ করে থেকে খানিকক্ষণ ছটফট করে। হাত কচলায়, পা কচলায়, গোঁফ ঘষে, তারপর হঠাৎ বলে, দোস্ত্‌ সচ্‌ বলছি, মেজাজটা শালা বিলকুল কি রকম হয়ে যায়। কত ভাবি, তবু রুখতে পারি না। ও কেন আমার কাছ থেকে চলে যায় না?

তবু তুই নিজেকে রুখতে পারবি না? জ্বলে ওঠে গোবিন্দ।

আর একটু চুপ করে থেকে বলে গণেশ, পারব। আর যদি হাত তুলি তো এ শালার হাত আমি নিজেই কেটে ফেলব। ঠিক বলছি----

চট্‌ করে মুখ ফিরিয়ে বলে গোবিন্দ, তা আমাকে কেন বল্‌ছিস্‌? যাকে পিটেছিস তাকে বল্‌।

সে এক অদ্ভুত মুহূর্ত। গণেশ প্রায় মিনিটে এক পা করে এগোয় ছুলারীর দিকে। কাছে গিয়ে ডাকে, এই···এই শোন্‌···

ছুলারীর শরীর ফুলে ওঠে কান্নায়। সে ঘোমটার আড়াল দিয়ে আড় হয়ে থাকে। গণেশ গায়ে হাত দিতেই ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দেয়।

আর পিটব না, গোস্তাকি হয়েছে। সচ্‌···মাফ করে দে এবার। ভরাট হয়ে আসে গণেশের গলা।

ছুলারী বলে অশ্রুরুদ্ধ গলায়, খালি বাতকে বাত।

না। সচ্‌···মরদ কি বাত···

দুলারী বলে, ঝুট।

গণেশ বলে, না, সচ্‌··· ··

দুলারী লুকিয়ে তাকায় গোবিন্দের দিকে। তার জলভরা চোখে হঠাৎ ঝিলিক দিয়েছে হাসি। গোবিন্দও টিপে টিপে হাসতে আরম্ভ করে।

গণেশ তাদের দুজনের দিকে তাকিয়েই দুলারীর ঘোমটা টেনে খুলে ফেলে, আর তারা তিনজনেই হেসে ওঠে।

কেবল গোবিন্দের মুখটা কেমন বোকাটে হয়ে ওঠে আর তার হাসিটা যেন অতিরিক্ত চড়া গলায় বেসুরো হো হো শব্দে ঘরটাকে কাঁপিয়ে দেয়।

ক-দিন ধরে বস্তিতে একমাত্র আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে ছাঁটাই। গান হাসি হল্লা সবই আছে, তবু এর মধ্যে ছাটাইয়ের কথাটা হয়ে উঠেছে মুখ্য।

কেউ বলছে, চারশো ছাঁটাই হবে। কেউ বলছে, চার হাজার। কারো ধারণা, একেবারেই হবে না, ওটা গুজব! আবার কেউ বলছে, তবে এখন নয়, দেরী আছে।

একই সঙ্গে আর একটা সর্বনাশও ঘনিয়ে আসছিল, সেটা এ বস্তির মেয়াদ। মামলা চললেও মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে জায়গা ছেড়ে দিতেই হবে। সেদিনের আর বেশী বাকি নেই।

সকলেই কিছু না কিছু বল্‌ছে এ সম্পর্কে কেবল পাশের সুদৃশ্য দোতলা বাড়িটা এ বস্তির গায়ে লেগে থেকেও যেমন এখানকার সব কিছু থেকেই আলাদা, ফুলকিও ঠিক তেমনি। ওই বাড়িটার রেডিও সংগীতের হঠাৎ রেশ ভেসে আসার মতই ফুলকির খিলখিল হাসি সবাই কান পেতে শোনে। সম্প্রতি তার প্রায়ই বাইরে রাত কাটে। আধিক্য ঘটেছে পোশাকের। সমস্ত জেনানা বহুড়ির দল হাঁ করে তাকিয়ে দেখে তার সাজগোজ। পুরুষেরা মুগ্ধ হয়ে দেখে তার হেলে দুলে চলন।

যখন সবাই কোন কথাবার্তায় মগ্ন থাকে, তখন ফুলকি এলেই তারা একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

ফুলকি অমনি বাঁকা হেসে, একটা দোলন দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে চলে যায়।

কিন্তু কেউ বিশেষ কিছু বলে না, কয়েকজন ছাড়া। সে কয়েকজন তার সঙ্গে একই কলে কাজ করে। তাদের মধ্যে নগেন একজন।

এ বস্তির সকলেই প্রায় ফুলকিকে ভালবাসে, স্নেহ করে। পাঁচ বছর আগে একদিন অচেনা ফুলকি একটা কালো কঙ্কালের মত এখানে ধুঁকতে ধুঁকতে এসেছিল। অনেক কথা সেদিন বলেছিল সে যে, তাকে হাসপাতাল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে বিনা ইলাজে। তার একটা বাচ্চা মারা গেছে……।

কিন্তু কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। কেন হাসপাতাল, কার বাচ্চা, সোয়ামী কোথায়, কিছুই না। তার অবস্থা দেখে সবাই তাকে চাঁদা করে সাহায্য করেছে, ঘর দিয়েছে বাড়িওয়ালা, নগেন দিয়েছে চাকরি যোগাড় করে। এরকম একটা মেয়ে একলা থাকলে যা হয়, সকলেরই নজরটা ঘোরে তার আশেপাশে।

এর দিলে রং লাগে, ওর চোখে লাগে নেশা।

কালো অবশ্য গোবিন্দকে এসব কথা বলেনি। অন্য সবার মুখে শুনেছে। কিন্তু ফুলকি নির্বিকার। সকলে ভাবে, বেওয়ারিশ হলেও একটা খাঁটি অওরত।

কেবল আশা ছাড়েনি কালো। তার বার বার ঘরভাঙা প্রাণের খোলা দরজা দিয়ে অষ্টপ্রহর উঁকি মেরে আছে একটা ভক্ত। সে আছে ছায়ার মত ফুলকির পিছে পিছে।

নগেনের গোবিন্দের প্রতি কটূক্তির পর কালো নিজে হাতে আজ পর্যন্ত রোজ ফুলকির ভাত নিয়ে যায়। কোন কোনদিন সকালে ফুলকিকে ঘরে না পেলে সেই ভাতগুলো সে ধরে দেয় ওই রুগ্ন ছেলেটির মধ্যবয়সী মাকে।

আগে সে গোবিন্দকে অনেক কথা বলেছে, সম্প্রতি আর বলে না।

এমন কি বাড়িওয়ালার দৈনন্দিন গাঁজার আড্ডায়ও আজকাল আর তাকে দেখা যায় না।
গোবিন্দ ভালবাসে কালোকে। দিনে দিনে কালোর এ অবস্থা দেখে ফুলকির প্রতি তার রাগটা ঘৃণায় পরিণত হচ্ছিল। সে ডেকে কালোকে একদিন জিজ্ঞেস করবে ভেবেছে, কিন্তু সে সুযোগ আসেনি। তার মাথায় অষ্টপ্রহর এক ভাবনা ও উকিলের ঘর দৌড়নোও বেড়ে গেছে। কালোকেও সময়মত পাওয়া বড় কঠিন।
শীতের রাত।
রকের ধারে ধারে একটা করে চটের ঢাকনা দিয়েছে সকলেই শীত আটকাবার জন্য। আকাশের পাতলা কুয়াশায় আর ধোঁয়ায় সব আচ্ছন্ন। দশটা না বাজতে সবাই ঘরে ঢুকে পড়েছে।
শুধু একটানা মাতাল গলায় চিৎকার করছে সেই রুগ্ন ছেলেটার বাপ। কুন্দ ফুলের গাছটা ফুলহীন, পাতাহীন। ছেলেটা আজকাল বেশীর ভাগ সময় ঘরের মধ্যেই থাকে।
গোবিন্দ তার রান্না সেরে ঘুরে এসেছে উকিলের ঘর।
এমন সময় কালো এল। গোবিন্দ একবার দেখে মুখ ফেরাতে গিয়ে হঠাৎ চমকে উঠল। দেখল কালোর চোখ সুদ্ধ কপালের একটা পাশ ফুলে উঠেছে, চোখের কোলে খানিকটা কাটা দাগ। গোবিন্দ বলল, কি হয়েছে কালো?
নিরুত্তরে কালো একটা থালা হাতে তুলে নিল। ওই থালাটায় সে রোজ ফুলকির ভাত নেয়।
কালো! গোবিন্দ কাছে এসে ডাকল।
বল!
কে মেরেছে তোকে?
কালো মুখ ফিরিয়ে অস্পষ্ট গলায় বলল, ফুলকি।
কেন?
সে কথার জবাব না দিয়ে কালো বলল, ভাত দেও।
কিন্তু গোবিন্দের সমস্ত শরীরটা যেন শক্ত হয়ে উঠল। মনে হল

কালোকেই বুঝি সে দু-ঘা কষাবে।

বলল, তবু শালা তুই—

ফোরটুয়েন্টি! ডেকেই থেমে গেল কালো, একটু চুপ থেকে বলল, এইটাই শেষ,···আর একবার······আর একবার······ ।

গোবিন্দ চাপা গলায় উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, শালা মরে যাবি যে! জান কি এতই সস্তা! কালোর হাসিহীন ঠোঁটের ফাঁকে অকালের ফোকলা মাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

মুহূর্তের মধ্যে গোবিন্দের মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল। অনেক দিন পর সে কালোর হাত ধরে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। এততেও জানটা কালোর কাছে দামী রয়ে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে যখন সবাই নানান জটলায় ব্যস্ত, তখন হঠাৎ নগেন এসে রান্নাঘরের কাছে বসে থাকা গোবিন্দের ঘাড়ে হাত দিয়ে ডাকল, ফোরটুয়েন্টি।

গোবিন্দ আজকাল কাজ ছাড়া বসে থাকলেই কেবল চিন্তাচ্ছন্ন থাকে। নগেনের ডাকে সে বিস্মিত হল। কারণ সেই রাত্রের পর থেকে আজ অবধি নগেনের সঙ্গে তার কথা নেই।

নগেন বলল, বাব্বা, তোমার গোসা যে আর কাটে না দেখছি।

নগেনের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল গোবিন্দ। যত দোষ সব ফোরটুয়েন্টি শালার। তুমি বুঝি রোজই কথা বলতে আস?

কথা টথা বল না, তাই বলছি। নগেন বলল।

নগেনের গলা এত মিষ্টি হতে পারে, গোবিন্দ ভাবতে পারে নি। নগেনের চোখ লাল ও আধবোজা। তার বেঁটে শক্ত শরীরে ক্লান্তির এলানো ভাব।

গোবিন্দ বলল, কি নগেন, ছাঁটাই শুরু হয়ে গেছে?

এখনো নয়। যেন খানিকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাটা বলে নগেন একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল, সেবারে সেই রাতে তুমি ভেবেছিলে

আমি ফুলকিকে মহব্বত পেশ করতে যাচ্ছি, অ্যাঁ ?

বলে সে একটানা জলের কল্‌কল্‌ শব্দের মত তাড়াতাড়ি বলে গেল ফুলকির সমস্ত কাহিনী। তার আসা থেকে শুরু করে সব। নগেন তার জন্য কত করেছে। অবশ্য একলা নয়, অনেকেই রয়েছে তবু নগেনকে ফুলকিই নিজে বলেছে, তুমি আমার যা করেছ, নিজের আদমিও তা কোনদিন পারে না। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। কিন্তু এ রকম কথা সে সারা বস্তির মরদদেরই বলেছে, যে জন্য সবাই তাকে নাম দিয়েছে প্রেমযোগিনী। কিন্তু···

নগেনের মুখটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। বলল, জানো ফোরটুয়েন্টি, আমাদের ছিপিয়ে ও অনেকদিন আমাদের লিবারবাবুর রেণ্ডিগিরি করে আসছে। হারামজাদী ভাবে, আমরা সে সব জানি না। কিন্তু কোনদিন কিছু দেখিনি বলে কিছু বলিনি। রাতে আমি রোজ খোঁজ নিতুম ও ঘরে ফিরেছে কি না। আর আজকাল ও আমাদের সেল সায়েবের কোঠিতে রাত কাটায়। আমি নিজে যেতে দেখেছি ···সচ,—সেল সায়েবের মেম বিলেত গেছে, এও জানি।···

ঝুট বাত। হঠাৎ কে বলে উঠল পাশের অন্ধকার কোণ থেকে।

চমকে নগেন ও গোবিন্দ দেখল কাছেই দাঁড়িয়ে আছে কালো।

চকিতে নগেন একটা ভাল্লুকের মত লাফ দিয়ে উঠল, ঝুট বাত ? ...ন, সেল সায়েবের মেম বিলেত যায়নি ?

কালো বলল, গেছে।

তবে ? তোর সাতকালের পীরিতের ফুলকি যায় না সায়েবের কোঠিতে ?

বলল, যায়। ছুটির পরে ও ঝিয়ের কাজ করতে যায়।

ঝিয়ের কাজ ? ক্রোধে ভয়ংকর হয়ে উঠল নগেন। বলল, আমাকে বোঝাতে এসেছিস্ ? বলেই জোড়া হাতের রদ্দা কষাল সে কালোকে, শালা ভেড়ো কাঁহিকা।

অপ্রস্তুত কালো ধাক্কাটা সামলাতে না পেরে রকের কোলে নর্দমার মধ্যে একেবারে নেয়ে উঠল। তার মূর্তি ও দুর্গন্ধে সে বিশ্রী ব্যাপার।

তার উপরে এই অসহ্য শীতে কেমন কাঁপন ধরে গেছে তার।
সমস্ত বস্তি হৈ হৈ করে ছুটে এল। শালা মহব্বত দেখাতে এসেছ? ঝুট বল্‌ছি আমি? বলে নগেন আবার কালোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে গোবিন্দ তাকে শক্ত হাতে ধরে ফেলল।
তবু নগেন তড়পাতে লাগল, পুছ্ শালা, কে না জানে তোর ফুলকি সেল সায়েবের কোঠিতে রাত কাটাতে যায়। পুছ্, কমিনা!
অনেকে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল,···আমি জানি।···আমি দেখেছি।···
এ রকম গণ্ডগোল হলেই মাদারি খেল্‌ওয়ালা তার ডুগডুগিটা বাজাতে আরম্ভ করে। আর চিৎকার করতে থাকে, ইস্টাপ্, ইস্টাপ্, ডোণ্ট হট্, তব্ ফট্ হো যায়েগা। মাই—অ—ড—র!···
নির্বিকার শুধু সেই রুগ্ন ছেলেটি, আর তার মা। তারা আছে তাদের নিজেদের কথায় মগ্ন। আর নির্বিকার সেই দেহতত্ত্বের বুড়ো গায়ক।
গণেশ তখনো আসেনি; দুলারী এসে তাড়াতাড়ি দাঁড়ায় গোবিন্দের কাছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই ফুলকি ঢোকে বস্তির উঠোনে।
একটা নাটকীয় মুহূর্তের মত হঠাৎ সবাই চুপ হয়ে যায়। ফুলকি এ লহমায় সব দেখে আবার ফিরে একেবারে বস্তির বাইরে চলে যায় যেতে যেতে তার আঁট করে পরা শাড়ি উড়িয়ে, টিপ ঝিলিক দি বাঁকা হেসে আগুন ছড়িয়ে যায়। আশ্চর্য! মানুষগুলো বোকা ব যায় সব।

এ স্তব্ধতার মধ্যে ছেদ পড়ল মাদারি খেলোয়াড়ের চড়া গলায়, দ্যাট কোল্ মাদারি খেল্। দি হুড়ী ইজ ফুড্ক। ফোরটুয়েন্টি, খানা লা আবার একটা গুল্‌তানি উঠল, কিন্তু জোরে নয়। ছত্রভঙ্গ হ গেল সব।

কেবল কালো পাঁক মাখা গায়ে ফুলকির অনুসরণ করে বেরিয়ে বাইরে। সমস্ত উঠোনটা একটা নাটকীয় মুহূর্তের যবনিকা পা মত থম্‌কে রইল।
গম্ভীর গোবিন্দ তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল নগেনের দিকে।
নগেন রাগতভাবেই মাথা নীচু করে বলল, কি করব। শালা

শুধু বাজে কথা বলে খচিয়ে দিল। আমি মিছে কথা বলি ?
কিন্তু গোবিন্দের মুখের কঠিন ভাবটুকু দূর হল না তাতে। নগেন সরে গেল। নোলক কাঁপিয়ে হাসছে লোটন বউ। তার কাছে বসে হাসছে নন্দ আর হরিশ। অন্যান্য দিন তাদের ব্যাপার নিয়ে এ সময়ে সবাই হাসাহাসি করে। আজ তারা হাসছে।
হাসতে হাসতে বলল লোটন বউ, মাগীটা ছেনাল!
বলে কাছেই পিচ্ করে একগাদা থুতু ফেলে দিল। তারপরে ভাত বেড়ে খেতে দিল নন্দ-হরিশকে। লোটন বউ পোয়াতী হয়েছে। সেজন্য তোয়াজের অন্ত নেই নন্দ-হরিশের। আজ এটা আনে, কাল ওটা আনে।
চেহারা ফিরেছে লোটন বউয়েরও। মাংস লেগেছে তার লম্বা চেহারায়। হঠাৎ মনে হয় একটা রূপসী রাজপুতানী।
তার পেটে সন্তান আসার পর থেকে নন্দ-হরিশের ঝগড়ার বহরটা আগের থেকে অনেক পরিমাণে কমে এসেছে। লোকের সমস্ত ধিক্কার বিদ্রূপ সয়েও মনে হয়, তারা তিনজনে সুখেই আছে। পোয়াতী হবার পর একদিন ওদের এ অঞ্চলের গ্রামবাসী ও আত্মীয় স্বজনেরা ওদের ছেঁকে ধরেছিল। কিন্তু একটা ভোজ দিতে তারা সবাই ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। ভোজটা সামাজিক অপরাধের জরিমানা হিসেবে দিতে হয়েছে।
এখানে কেউই প্রায় ওদের সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না। কিন্তু গোবিন্দ বলে। লোটন বউ যত দূর দূর করেছে, নাছোড়বান্দা হয়ে গোবিন্দ তত কাছে কাছে গেছে।
তারপর একদিন লোটন বউ বলেছে, গোবিন্দকে নিজেদের দোস্ত্ ভেবেই, এখানে কেউ আমাদের দেখতে পারে না। আমাদের ঘর ভেঙ্গে দিতে চায় সবাই।
গোবিন্দ বলেছে, এ কিরকম ধারার ঘর। তুমি কি সুখে আছ।
সে বলেছে, এ দুনিয়ার সুখ দুখ কি জানি না, খালি ওরা দুটোতে বিবাদ না করলেই আমার সুখ।

গোবিন্দ বলেছে অবাক হয়ে, কিন্তু দুজনকে নিয়ে তুমি কেমন করে আছ ?

লোটন বউ বলেছে, কি করব ? ওটাই আমার কিস্‌মৎ।

কিস্‌মৎ ? হ্যাঁ, তাই তো ! লোটন মরে যাবার পর সে কত কি ভেবেছিল। সে সমস্তই তার পবিত্র বৈধব্য জীবনের অঙ্গীকার। কিন্তু এই দুজন ? সে যে মানুষ। হলই বা মেয়ে-মানুষ। সে এক পাখ্‌না ঝরা শীর্ণ ময়ূরী। ওরা দুটোতে জোড়া ময়ূরের মত পেখম মেলে কেবলি ঘুরেছে তার চারপাশে। কখনো হেসে, কখনো গেয়ে, কখনো দীন চোখে। তারপর কবে একদিন গুরু গুরু করে মেঘ ডেকে উঠেছিল তার দেহ ও মনের আকাশে। খোলা পেখমের রং আর তাকে সেদিন মুক্তি দেয়নি। কার কাছে সে প্রথম আত্মসমর্পণ করেছিল, তাও আজ আর মনে নেই, কেমন করে জড়িয়ে পড়ল দুজনের মাঝখানে। আশ্চর্য ! একটুও অস্বাভাবিক বোধ হয়নি দুজনের কাছে নিজেকে সঁপে দিতে। হৃদয়ে ফাটল ধরেনি দুই দুই ক'রে। ওরা দুজনে মিলে একটা হয়ে গিয়েছিল। ভাগাভাগির কথা মনে করতে সে পাপ বোধ করেছিল। বিচিত্র পাপবোধ তার ! ওরা দুজনেই তার প্রেমিক, তার নিকটতম। তার সুখ ও দুঃখ। সে যে দুটি হৃদয়ের অধীশ্বরী, একথা ভেবে তার বাইরে লজ্জা, ভেতরে মহৎ আনন্দ, ঔদার্য ও গর্ব।

কিন্তু ওরা দুটিতে ঠোকাঠুকি শুরু করেছিল। সংসারের এ স্বাভাবিক নিয়মটাকেই অনিয়ম ভেবে সে কেঁদেছে ও রেগেছে। গোবিন্দকে বলেছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, মগর ওরা ঝগড়া করে। খালি ঝগড়া। খালি এইজন্যেই আমাকে একদিন ভেসে যেতে হবে।

গোবিন্দ প্রথমটা একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল কিন্তু আর সকলের সঙ্গে সেও এ ব্যাপারে এখন বিস্মিত হয় না আর।

কেবল নন্দ-হরিশের মারামারির সময় বাড়িওয়ালা যখন ওদের পিটতে যায় তখন গোবিন্দ তাকে, বাধা দেয়। সে দেখেছে লোটন বউ দরজা বন্ধ করলেই ওরা থেমে যায়।

কিন্তু লোটন বউ পোয়াতী হওয়ার পর থেকে যেন সুখের দশা লেগেছে। নন্দ-হরিশ যেন কোন্ নতুন জগতে বন্ধনের সন্ধান পেয়েছে। তবু সেই জগতও মাঝে মাঝে অন্ধকার হয়। ওরা মারামারি করে। যখন ওরা ভাবে, যে আসছে সে কার। লোটন বউ বলে, কারুর নয়। আমাদের তিনজনের।

ছাঁটাই!

সন্ধ্যাবেলা সমস্ত বস্তিতে হট্টগোল। একদল গান জুড়েছে সীতার বনবাসের, কোন্ ঘরে সব ভোলা রসিকের হারমোনিয়ামের পোঁ পোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে, কোন কোন দল নিছক গল্পে জমেছে। নর্দমার ধারের কোল আঁধারে ঘাপটি মেরে বসেছে কয়েকটা বাচ্চা।

এরই মধ্যে ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে একটা বৈঠক ডেকেছে গণেশ। সেখানে বসেছে অনেকে। এ বৈঠক প্রায় প্রত্যহের ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

রান্নার ফাঁকে ফাঁকে এ বৈঠকে গোবিন্দ আসে। কথাও বলে। এবং তার কথা আরম্ভ হলে দেখা যায়, অনেকে ওদিকে ঝুঁকে পড়েছে।

গণেশ কিছুটা বিব্রত ও বিরক্ত বোধ করে। কোন কোন সময় নিজেই গোবিন্দকে বেমক্কা প্রশ্ন করে বসে।

গোবিন্দ হটে না, প্রত্যেকটি কথার সে এমন জবাব দেয় যে, এর পরে আর কোন কথা ওঠে না।

দুলারী এ বৈঠকের প্রত্যহের একজন। সে কতখানি শোনে জানি না, গণেশ আর গোবিন্দের দিকেই তার নজর পড়ে থাকে।

গণেশ কিছু উত্তপ্ত, গোবিন্দ ঠাণ্ডা। গোবিন্দের আলোচনায় একটা ঘরোয়া সুর আছে। কিন্তু গণেশের কথায় ক্রোধ বেশী। সে নাগালের বাইরে, গোবিন্দ কাছে।

গণেশ গোবিন্দকে ধরে ধরে বাইরে অন্যান্য এলাকায় নিয়ে যায়। পরিচয় করিয়ে দেয় তার অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে। তাদের দলের মধ্যেও এ ফোরটুয়েন্টির খাতির বেড়ে উঠেছে আজকাল। বিশেষ

গোবিন্দ তাদের অনেক আগের চেনা মানুষ। অনেক পুরনো মানুষ তাকে চিনতে পারে। জড়িয়ে ধরে বুকে। বলে, আবার তুই? তারপর পুরনো দিনের কথা পেড়ে বসে। সাহেবের কথা, কারখানার কথা। কবে কখন তারা কি করেছে, সেদিন আর এদিনে তফাৎ হয়েছে কতখানি।

আজকের বৈঠকটা সবে বসেছে, এমন সময় নগেন এল প্রায় একটা ক্রুদ্ধ মোষের মত ফুঁসতে ফুঁসতে। তার সঙ্গে আরো কয়েকজন।
'নগেন কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা গোবিন্দের কাছে গিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বলল, ফোরটুয়েন্টি, সেল সায়েব শুয়োরের বাচ্চা আজ আমাকে শাসিয়েছে, সে নাকি আমাকে কোতল করবে। আমি জানের পরোয়া করি, না, কোতলের ভয় করি?
বলতে বলতে তার রক্তচক্ষু জ্বলে উঠল। সবাই এসে ভিড় করল সেখানে।
নগেন প্রায় কান্নার মত করে চেঁচিয়ে উঠল, ফুলকির জার সেল-সাহেব আমাকে পাছায় জুতোর ঠোক্কর মেরেছে। বলেছে, আমি নাকি ফুলকিকে আমার রেণ্ডি করতে চাই, তার পেছুতে লেগে থাকি। তাকে নাকি ফুলকি বলেছে। আর এই ফুলকিকে আমরা—
বন্ধ হয়ে গেল তার গলার স্বর। তবুও বলল ফিস্ ফিস্ করে, সকলের সামনে ফুলকি আমাকে বলে কিনা, কুকুরের আবার খাসির গোস্ত্ খাওয়ার নোলা।
ঠিক এ সময়েই ফুলকি ঢুকল হেলে দুলে। পিছনে তার কালো।
ফুলকির দুঃসাহস ও বেহায়াপনা এতই উগ্র যে, নগেনকে অপমান করেও সে আবার এখানে স্বাভাবিকভাবে এসে ঢুকেছে।
এক রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত। চকিতে নগেন প্রায় একটা বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ফুলকির উপর। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকে।

পরমুহূর্তে দেখা গেল ফুলকি একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় ছুটোছুটি করছে, চিৎকার করছে ডাক ছেড়ে। আর তাকে ঘিরে রয়েছে যেন একদল বন্য উন্মাদ ক্ষ্যাপার দল।

নগেন তার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানি দিয়ে চীৎকার করে উঠল, দেখা সবাইকে, সেল সায়েবের কাছে বিকোনো চেহারাটা সবাইকে দেখা।

হঠাৎ কে পাঁক ছুঁড়ে দিল এক গাদা ফুলকির গায়ে, কেউ ধুলো, কেউ শুধু জল। জলার পেত্নীর মত দেখাচ্ছে ফুলকিকে।

নানান গলায় চীৎকার উঠছে, আমার পয়সা ও খেয়েছে। আমি না খেয়ে ওকে দিয়েছি।

আমি নিজের গাঁট থেকে ওকে দাবাই এনে দিয়েছি।

কেউ কেউ ফুলকির অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম করে করে সমালোচনা করছে।

আশ্চর্য! এতদিন এত রাগ কোথায় পোষা ছিল।

পাশের দোতলা বাড়িটার জানলায় উঁকি মেরেছে অনেকগুলো মুখ। হাসছে সব খিলখিল করে। শিশু গলায় চিৎকার ভেসে এল, একটা ন্যাংটো পাগলি রে!

গোবিন্দ একেবারে স্থাণুর মত, স্পন্দনহীন। কি যে ঘটেছে সে যেন বুঝতেই পারেনি। যে মুহূর্তে সে সম্বিত ফিরে পেল, সেই মুহূর্তে সমস্ত গণ্ডগোল ছাপিয়ে গলা ফাটিয়ে গর্জে উঠল, নগেন!

উঠোনের সবাই চমকে তার দিকে ফিরে তাকাল।

গোবিন্দ ছুটে এসে বলল, ফুলকি ঘরে যা।

সুযোগ পেয়েই ফুলকি লহমায় ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চেঁচাতে লাগল একটানা নাকি গলায়।

গোবিন্দের এই মুহূর্তের মত চেহারা বুঝি কেউ কোনদিন দেখেনি। নিষ্ঠুর, জ্বলন্ত একটা মস্ত কয়লার ড্যালা যেন। নগেনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, শালা দুনিয়াভর তো রেণ্ডি আছে, সে সবার পয়সায় খায়। তুই বাড়িওয়ালাকে বললি না কেন ওকে তাড়িয়ে দিতে।

বলেই সে আচমকা একটা ঘুসি বসিয়ে দিল নগেনের চোয়ালে। নগেন হতভম্ব, অত বড় জোয়ানটা চুপসে গেল। ঠোঁটের কষে রক্ত দেখা দিল তার। তোদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে যে শালা ফুর্তি করে সেল সায়েব তাকে ক-দিন এ রাগ দেখিয়েছিস্? কুকুরের পেছনে তুইও কুকুর হবি? বলে সে আবার নগেনের চোখে মুখে উপর্যুপরি কষাল কতকগুলি সাংঘাতিক ঘুসি।—শালা, বড় হাত চালাতে শিখেছিস্?

গণেশ এসে দু-হাতে জাপটে ধরল গোবিন্দকে। দোস্ত্ কী করছ? বাড়িওয়ালা ডাকল, ফোরটুয়েন্টি!

নগেন হঠাৎ চাপা গলায় চিৎকার করে উঠল, হাঁ আমাকে মেরে ফেল. —খুন করে ফেল,···বরবাদ করে দেও!

একটা প্রেতপুরীর নিস্তব্ধতা যেন নেমে এসেছে। সবাই ভীত সন্ত্রস্ত চোখে গোবিন্দকে দেখছে।

বাড়িওয়ালার দিকে ফিরে বলল গোবিন্দ, এখুনি তুমি হুকুম কর ফুলকিকে বেরিয়ে যেতে।

হুকুমের আগেই কাপড় পরে বেরিয়ে এল ফুলকি। আহা, কোথায় সাজগোজ, কোথায় বা অত দোলানি। ফুলকির মুখ যে এত কুৎসিত হতে পারে, এখন না দেখলে বোঝা যায় না। চোখে তার জল নেই. গজরাচ্ছে সে, আমি নিজেই যাচ্ছি, কারো পরোয়া করি না। এর শোধ যদি না তুলি, তোদের যদি না আমি সজুত করি তো আমি কুত্তিরও অধম।

গোবিন্দ তার দিকে ফিরে তাকাতেই সে ছুটে বেরিয়ে গেল। তার পেছনে কালোও বেরিয়ে যাচ্ছিল! ফুলকি আচমকা পেছন ফিরে তার চোখে মুখে দু' হাতে আঘাত করে চেঁচিয়ে উঠল, কেন আসছিস মদ্দা কুত্তা? যা যা, যে নরক তোদের ঠাঁই, সেই নরকে গিয়ে থাক্' বলে সে উধাও হল। কিন্তু কালো যেমন যাচ্ছিল, তেমনি মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে চলে গেল।

কি রকম নিঝুম হয়ে গিয়েছে সারা বস্তিটা। নিঝুম কিন্তু শান্ত

যেন ঐ ঝড়ের জন্য সবাই প্রতীক্ষা করছিল। আজ সেই ঝড় হয়ে গেল। এখানে সেখানে লম্ফ আর ফেঁসোর দলা জ্বলছে টিম্ টিম্ করে। বাড়িওয়ালা আর গণেশ নগেনকে খাটিয়ায় শুইয়ে দিয়ে বসেছে তার পাশে।

গোবিন্দ যন্ত্রের মত রান্নাঘরে রুটি সেঁকে চলেছে। উনুনের গন্‌গনে আঁচে তার ঘর্মাক্ত শরীরটা রক্তের মত লাল হয়ে উঠেছে। অন্যান্য দিনের মত এসময়ে আজ কারো খেতে চাওয়ার তাড়া আসছে না।

রুগ্ন ছেলেটা নীল শরীরে বসে আছে রকে। তার গলার স্বর আজকাল বন্ধ হয়ে আসছে। সুতো বাঁধা সেই কুন্দ গাছটার ফুল নেই, পাতা নেই, ঝাড়ুর কাটির মত রয়েছে দাঁড়িয়ে। তার মাতাল বাবা ঘরের মেঝেয় শুয়ে আছে, নেশার ঝোঁকে গুটিশুটি হয়ে।

সেই বুড়োটে গম্ভীর গলা আজ গানের মত বলছে ঃ

দুনিয়ার সব জায়গা থেকে আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে এলে ঠাকুর, সবাই বললে, সবখানেই তোমাকে পাওয়া যায়, কিন্তু আজও তোমাকে পেলুম না!

মাদারি খেল্‌ওয়ালা, তার ডুগডুগিটার চামড়ায় থুতু দিচ্ছে, ঘষছে আর বিড়্‌বিড়্ করছে, দিসিস্ ব্যাড্, অল্‌শালা খচ্চর।···ফুল, ইস্টাপেড্···। তারপরেই একটা ঢোঁক গিলে বলে ওঠে নিস্তেজ গলায়, কখন যে খেতে দেবে!···

রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল দুলারী। গোবিন্দ একবার ফিরে দেখল, কিছু বলল না।

দুলারী হঠাৎ অশ্রুরুদ্ধ গলায় বলে উঠল, এ দুখভোর জিন্দীগীতে যাদের কাছে গেছি তারা সবাই এমনি,···তুফানের আগে তারা ছোটে, জান নিয়ে হোলি খেলে। আমার ঘর তোড়ফোড়, জান চৌপাট তবু তারা বিপদের পথ ছাড়বে না। কাহে···কাহে?

তার ঘরভরানোর সব আশা গণেশ ধূলিসাৎ করেছে, বাইরের সংগ্রামী জীবনটাই তার একমাত্র জীবন। আর আজ গোবিন্দের মত দোস্তকে সেই একই পথের শরিক দেখে কান্না মানছে না দুলারীর।

রাত্রি কত ঠিক নেই। চারদিক স্তব্ধ, অন্ধকার।

হঠাৎ নগেন জেগে গেল। কে যেন তার গায়ে মুখে আস্তে আস্তে হাত বুলাচ্ছে। তার সারা মুখে ব্যথা, ফুলে গেছে।

কে?

একটুখানি নীরব, তারপর শোনা গেল, আমি ফোরটুয়েন্টি।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর কোন কথা শোনা গেল না। দুটো বলিষ্ঠ বুকেই বুঝি নিশ্বাস একেবারে আটকে গেছে। নিথর নিকষ কালো রাত্রি। বোবা পৃথিবীর তলায় যেন শুধু জলের কল্‌কল্ শব্দ।

নগেনের মুখের উপর রাখা হাতটা ভিজে গেল গোবিন্দের। সে ডাকতে গেল নগেনকে, স্বর ফুটল না। একটু পরে আবার বলল, নগেন···আমাকে মাপ কর ভাই।···

নগেন দু-হাতে গোবিন্দের হাতটা চেপে ধরে একেবারে ছেলেমানুষের মত ফুঁপিয়ে উঠল। গোবিন্দের হৃৎপিণ্ডটা ফুলে উঠল ফানুষের মত।

অনেকক্ষণ পর নগেন বলল, তোমাকে মাপ করবার মত কেউ জন্মায়নি। তুমি আমাকে আজ বাঁচিয়েছ। বলে সে একটু চুপ করে থেকে আবার বলল ভাঙা গলায়, তুমি না থাকলে আজ আমি না জানি কি করতাম।···হয়তো সকলের সামনে···আমি ওকে···। হ্যাঁ, আমি তখন একটা রোখা কুত্তারও অধম হয়ে গেছ্‌লাম। ফোরটুয়েন্টি ···আমরা জানোয়ার একেবারে, জানোয়ার।

জানোয়ার! খানিকক্ষণ চুপ থেকে গোবিন্দের মোটা গলায় একঘেয়ে সুর শোনা গেল, ঘর নেই, দেশ নেই, শরীরটাও শালা বুঝি আপনার নয়। জানোয়ার আমরা।

বলে একমুহূর্ত চুপ করে থেকে সে হঠাৎ তীব্র চাপা গলায় বলে উঠল, কিন্তু এ শালা আইনটা কোথাকার? আমরা কি ভালো হতে পারিনে? তোকে মারলুম কেন? না, তুই ফুলকিকে মারলি। তাতে কি হবে? শয়তানের সোহাগে ওর সোহাগী গায়ের রোঁয়া

ফুলে উঠেছে। কিন্তু কদিন? কালকেই আবার সেল সায়েব শালা
ওকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দেবে, ও এসে আবার আমাদেরই দলে
ভিড়বে। এখানে না হোক্ অন্যখানে। তখন? তাতে আমাদের
ক ভালোটা হল। আর সেল সায়েবের জুতোর ঠোক্কর বা বন্ধ হল
কোথা? আমরা যদি খেয়োখেয়ি করি, আমাদের ব্যবস্থা করবে কে?
কি, জন্মোটা শালা ফালতু দিয়েছিল বাপ মা?
নগেনের মার খাওয়া ফোলা মুখটা অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। ফুলো
মাংসের ভিতরে তার চোখ দুটো যেন নবজাত শিশুর চোখের মত
উজ্জ্বল। তার সে চোখের দৃষ্টি গোবিন্দের সারা মুখে কি যেন
খুঁজেছে আঁতিপাঁতি করে।
গোবিন্দ যেন বাপের মত নগেনের দিকে আরও খানিক ঝুঁকে পড়ে
বলল, মহামারী আসে মারতে, আমরা তাকে তাড়াই, মারতে আসে
ঝড় আমরা ঘর বানাই আর এ জীবনটাকে পারি না মন্দ থেকে
ভালো করতে? অনিয়মের নিয়ম চাই, এ সোজা কথাই বুঝি।
মার তো খাচ্ছিই পড়ে পড়ে, আবার নিজেরাও মারামারি করব?
শুধু এই একটি কথা বলে স্তব্ধ হয়ে গেল নগেন। অনেকক্ষণ পর
বলল আবার, ফোরটুয়েন্টি, প্রাণটা মানেনি। কালো ওর পেছনে
মারে? আমি পারি না। কিন্তু ফোরটুয়েন্টি, যাকে সব দিয়েছি
সেই ফুলকি এমন হল কেন তাই ভাবি।
রাত্রি পুইয়ে আসছে। পাশের বাড়িটার কলের জল পড়ার শব্দ
শোনা যাচ্ছে। গ্রীষ্মের ছোট রাতের অন্ধকার কেটে ফুটছে আলো।
দেখা গেল বাড়িওয়ালা কখন এসে দাঁড়িয়েছে তাদের কাছে। বলল,
ফোরটুয়েন্টি, এদিকে আয়।
কিন্তু গোবিন্দের মুখে কোন কথা নেই, অনড়, নিশ্চল। কি এক ভাবে
যেন সে বিভোর হয়ে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল উঠোনের দিকে।
সেই বুড়োটে গলায় আপসোসের সুর ফুটল:

তবে কি গো দেখা হবে,
ভবের-খেলা সাঙ্গ যবে—?

ছাঁটাই !······সামাল ! ঝড় এসেছে !···

ছুপুরের খাবার সময়ে কেউ খেতে এল না। যে ছু-একজন এল, তার খেতে পারল না। সময় নেই, হারজিতের লড়াই লেগেছে। সেখানে চারদিকে পুলিশের বেষ্টনী, ভিতরে অভ্রভেদী ঘেরাওয়ের ব্যূহ এতদিনের সমস্ত প্রস্তুতির পরীক্ষার ফল হাতে নাতে নিয়ে ফিরতে হবে। সমস্ত সংশয়ের মাথায় বাড়ি দিয়ে সে এসেছে। লৌহ ঘেরাও মাথা তুলেছে সংশয়হীন।

কারখানার থমথমানি বস্তিতে এসে পড়েছে। সমস্ত বস্তিটা যেন প্রতীক্ষা করে আছে ঝিম্ মেরে। বাড়ির ওপারে রাবিশ ফেলা রাস্তাটা আজ ফাঁকা, কর্ড রোডের ধারে গাছগুলো স্তব্ধ। আকাশ গুমোট।

বাড়িওয়ালা খানিক বসে আর খাটিয়া এপাশ ওপাশ করে। গোঁফ মোচড়ায় আর বি টি রোডের বুকে মিশে যাওয়া রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

গোবিন্দ রান্নার ফাঁকেই উধাও হয়ে যাচ্ছে, আর ফিরে ফিরে আসছে।

ছুলারী ছুটে ছুটে বাইরে যায়, আবার ঘরে এসে শুয়ে পড়ে গোবিন্দকে বলে, কী অবস্থা ?

ঠাওর পাচ্ছিনে। টেনে জবাব দেয় গোবিন্দ।

রুগ্ন ছেলেটার মা কাজ করছে আর বলছে, ভগবান···মুখ রেখ কাজটা গেলে সবাই মরব।

সন্ধ্যার পর সমস্ত নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দূর থেকে ভেসে এল মিলিত গলার কোলাহল, ট্রাকের গোঙানি, হুইসলের সংকেতধ্বনি।

আচমকা বন্যার মত পথে পথে জুটছে মানুষ। কী হল ? কী হল ?

গোবিন্দ ছুটে বেরুবার মুখে দেখল সামনে দাঁড়িয়ে নগেন···অভুক্ত ক্লান্ত।

কী হল নগেন ?

ভেস্তে দিয়েছে।

কী করে ?

নগেন ধাঁধা ভরা চোখে বলল, শালা টেরই পেলাম না। আমরা ক ছিলুম···ম্যানেজার শালা পেরায় কাত মেরেছিল, সেল সায়েবটা র পায়ে ধরতে অব্‌ধি এসেছিল, মাইরি ! এর মধ্যে কে যে শালা পুলিশের গায়ে ঢিল মারলে, ব্যস্ অমনি পুলিশ লাঠি চালিয়ে দিলে।···তাজ্জব, কেউ পয়লা পালাচ্ছিল না, কতকগুলো ডরপোঁক এমন চেঁচামেচি করে ছুটতে লাগল —

গনের কথা শেষ হতে না হতেই দেখা গেল অনেকে ফিরে আসছে। জমজমাট হয়ে উঠেছে বস্তি।

দেখা গেল সর্বসাকুল্যে এগারজন এ বস্তির ছাঁটাই হয়েছে।

লারী এর ওর পিছনে ছুটেছে, জিজ্ঞেস করছে, আমার আদমিটা··· তাকে দেখেছ ?

একজন বলে উঠল, আমি দেখেছি।

কোথায় ?

য়জনের সঙ্গে তাকে একটা জালের গাড়িতে পুলিশ ধরে নিয়ে ছে।

র একজন বলল, হ্যাঁ আমিও দেখেছি। তাকে আমি হাঁক লুম—

লারী তখন একটা চিৎকার করে বাইরের দিকে ছুটে গেল, আমি নতুম—জানতুম !

গোবিন্দ গিয়ে তাকে ধরে ফেলল, দোস্তানি যেও না এ ভাবে— না।

লারী হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য জোর করে কেঁদে উঠল, আমি নায় যাব।

ক চেঁচিয়ে উঠল, গাড়িটা সদরের দিকে গেছে।

লারী মাটিতে মুখ দিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে উঠল, জানতুম—জানতুম।

এমনি করে আমার ঘর ভাঙবে—জানতুম।

গোবিন্দ তাকে জোর করে ঘরে নিয়ে গেল। অনেক কথা বলল
কিন্তু দুলারীর কান্নার তোড়ে ভেসে গেল সব।

রাতভর বস্তিটা কাঁদতে লাগল যেন। কখনো চাপা গলায় কখ
হাউ হাউ করে, কখনো নিঃশব্দে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

ভোরবেলা গোবিন্দ দরজা খুলেই দেখল লোটাকম্বল হাতে নগে
দাঁড়িয়ে আছে। বলল, ফোরটুয়েন্টি চললুম বেরাদার।

কোথায় যাবে? চমকে উঠল গোবিন্দ।

নগেন হেসে বলল, কাজের খোঁজে। এখানে পারলাম না, মা
খেলাম। আর এক জায়গায় যাই। দেখি কতদিন এমনি প
পড়ে মার খাই। একদিন কি···

তারপর হঠাৎ হাসিটা উবে গিয়ে মুখটা তার গম্ভীর হয়ে উঠ
ফোরটুয়েন্টি চলে যাচ্ছি, মনে কোন দুঃখ রেখ না। আর···মাই
বলছি, তোমাকে কোনদিন ভুলতে পারব না। সম্বল নেই আধল
কিন্তু কালরাতের তোমার কথাগুলোই আমার সম্বল।

বলে সে তাকাল গোবিন্দের দিকে। এখনো তার চোখে মু
আঘাতের দাগ। আবার হেসে সে পিঠে ঝোলা নিয়ে চলতে শু
করে হঠাৎ আবার দাঁড়াল। ফিরে এসে তাড়াতাড়ি বলল, জা
ফোরটুয়েন্টি, রাগটা শালা চণ্ডাল। ফুলকি যদি কখনো আসে ত
বলো—বলতে বলতে হঠাৎ থেমে চকিতে পিছন ফিরে
চলে গেল।

গোবিন্দ তাকে ডাকতে চাইল, স্বর ফুটল না গলায়। কেবল তা
বুকের মধ্যে যেন কে হৃৎপিণ্ডটা দু-হাতে মুঠো করে টিপে ধরে
চেপে দিয়েছে কণ্ঠনালীটা।

ছাটাইয়ের ঘা দগ্‌দগে হয়ে উঠেছে! হরিশ-নন্দ বেকার হয়ে অব
দিনে রাত্রে মারামারি আরম্ভ করেছে আবার। সেই রুগ্ন ছেলেট

ঝাপ দাপাদাপি করছে পাগলের মত। সবাই ছুটোছুটি করছে ইঁটের কারখানায়, কাঠের গোলায়, রিক্‌শা মালিকের দরজায়।

গোবিন্দের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই বাড়িওয়ালা বলছে, আমি কি করতে পারি?

অর্থাৎ বস্তির এ বিড়ম্বনার দায়িত্ব যেন অনেকখানিই তার।

দুলারী খাওয়া দাওয়া বন্ধ করেছে, সারাদিন পড়ে আছে ঘরে।

গোবিন্দ এসে ডাকল, দোস্তানি!

দুলারী মুখ তুলল। কান্নায় ফোলা মুখ।

গোবিন্দ কাছে এসে তার পাশে বসে বলল, দুখ কি জীবনভর থাকে?

কেন ঘর কর? ওর মনে যদি এই ছিল, তবে কেন আমার জান চৌপাট করল।

এলানো আঁচল, এলো চুল, সিন্দূরহীন কপালে দুলারী যেন যোগিনী হয়েছে।

গোবিন্দ বলল, গল্‌তি সমাঝো না গণেশকে। সে হল আসল ঘরওয়ালা মানুষ, ওর প্রাণে যত মহব্বত, তা আর কার আছে? দোস্তানি, ওর কানে যে মন্ত্র পড়েছে, তাতে ও সিদ্ধির নেশায় পাগল হয়ে গেছে। জেল ফাঁসি সেখানে তুচ্ছ। তুমি আমিও একদিন ওর মতই পাগল হয়ে ছুটে যাব। বলতে বলতে তার দৃষ্টি অসীম শূন্যে হারিয়ে গেল। সে চোখে যেন ঝলমলিয়ে উঠল কিসের আলো।

দুলারী তাকাল গোবিন্দের মুখের দিকে। গোবিন্দের মাথাটা মস্ত বড় হয়ে উঠেছে চুলের ভারে। মুখটা শুকিয়ে যেন শিশুর মত ছোট হয়ে গেছে। ক্ষীণজীবী হয়ে গেছে বড়। হঠাৎ তার বড় লজ্জা করে উঠল যেন নিজের কান্নার জন্যে। সে গোবিন্দের হাত ধরে বলল, কী দেখছ তুমি?

আচমকা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল গোবিন্দ, কিছু না।

এরকম জবাব শুনে আবার কান্না আসে দুলারীর। বলল, জানি,

তুমিও কোন মতলব ভাঁজছ। দিনরাত তোমার পেছনে দুশমন,—তুমিও আমাকে ছেড়ে যাবে।

না দোস্তানি, আমরা সব একসঙ্গে যাব।

দুলারী বলল, তা যদি হয়, তাহলে তো আমিও তোমাদের সাথী হতে পারব।

হাঁ দোস্তানি···তাই। বলে গোবিন্দ নিজের হাতে তার চোখের জল মুছিয়ে দিল। দিয়ে কেমন যেন অবশ শরীরে সে দুলারীর গালে হাত রেখে নিঝুম হয়ে গেল। পরমুহূর্তে দুলারীর নিশ্বাসে চমক ফিরতেই, দুলারী জিজ্ঞেস করল, কি? কিছু না। বলে বেরিয়ে গেল গোবিন্দ।

দুপুর বেলা। নিঝুম বস্তি। নতুন আর পুরনো বেকারেরা বেরিয়েছে, হন্যে ক্ষুধার্ত শিকারীর মত। বউ আর বাচ্চাগুলির কষ্ট বেড়েছে। এক মুহূর্ত বসে থাকার উপায় নেই। তারা ফিরছে শহরের আশেপাশে গোচারণ ভূমিতে গোবরের সন্ধানে। রেলের লাইনে পোড়া কয়লার জন্যে, শহরের কাগজ ও রাবিশ, দূর গ্রামের পথে পথে শুকনো ডালপালা কুড়োবার জন্য।

লোটন বউও গোবর কুড়িয়ে এনেছে। কুড়িয়ে এনে হাঁপিয়ে পড়েছে। তার পেট উঁচু হয়ে উঠেছে অনেকখানি। কালি পড়েছে চোখের কোলে। চেহারাটি চওড়া হয়েছে আরো।

এসে দেখল ঘর খোলা। ঢুকে দেখল, জিনিসপত্র তছনছ। সারা গায়ের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল অসহ্য যন্ত্রণা। বুঝল, ওরা দুজন মারামারি করে গেছে। ওরা দুজন, যাদের দ্বৈত-মনের মণি রেখেছে সে তার জঠরে। কিন্তু ওরা বুঝি আজ তাকে নির্বিঘ্নে আসতেও দিতে চায় না। আর যদি সে আসে, যখন সে আসবে তখন ওরা কি করবে? ওরা ঝগড়া করে, ছিনিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে হয়তো তাকে। তার অপমান, কলঙ্কের সুন্দর ডালিকে।

আতঙ্কে নিজের পেট দু'হাতে জড়িয়ে ধরল সে। ঘা খাওয়া ক্রুদ্ধা সর্পিণীর মত শূন্য ঘরটার চারপাশে দেখল তাকিয়ে তাকিয়ে। ওরা আজ ক্ষিপ্ত! মানুষের বাইরে। তার রক্তে, নাড়িতে নাড়িতে যে জড়িয়ে আছে, তাকেও ওরা তছ্‌নছ্‌ করতে আসবে এই ঘরটার মত! ইস্‌! লোটন বউ তো বাচ্চাখাগী বেড়াল নয়। সে পেটে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বলতে লাগল, চলে যাব বাছা তোকে নিয়ে। আমার যাদুমণি, সোনামণি, ওদের সামনে এ সংসারে আনব না আমি তোকে।

ক-দিন পর ভোরবেলা নন্দ-হরিশের চিৎকারে হুলুস্থুল পড়ে গেল সারা বস্তিময়। সবাই সেখানে ছুটে এল। কী হয়েছে?

লোটন বউ পালিয়ে গেছে!

নন্দ হরিশ পাগলের মত ছুটোছুটি শুরু করল এখানে সেখানে, মহল্লায় এলাকায়। জান পহ্‌চান আদমি আত্মীয়স্বজনের ঘরে।···নেই কোথাও।

সারা দিন পরে একেবারে নিরাশ হয়ে তারা দুই ভাই হঠাৎ নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল।

ও বলে, তুই তো শালা রোজ আগে মারামারি করতিস্‌?

ও বলে, তুই তো করতিস্‌।

বলতে বলতে তারা হঠাৎ হাতাহাতি শুরু করে দিয়ে আবার নিজেরাই থেমে গিয়ে যেন অবাক্‌ হয়ে ঘরের খোলা দরজাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ছাই পোড়া উনুন, রান্নার সরঞ্জাম সব পড়ে আছে। পাতা আছে লোটন বউয়ের পিঁড়িটা। কালকের মারামারির সময় ওটা আর তোলা হয় নি।

গোবিন্দ এসে কাছে দাঁড়াতেই নন্দ বলে উঠল, বলেছিল সে, আমরা মারামারি করলে গলায় দড়ি লাগাবে।

হরিশ জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, তবে বাচ্চাটাও মরে যাবে তো?

কথা না বলে সরে আসে হঠাৎ গোবিন্দ। আজকাল কেমন অস্থির অস্থির লাগে তার। নিজেকে বড় একা মনে হয়। জগতে সে

যেন নিঃসঙ্গ। দুলারীর কাছে বার বার যেতে চায় মনটা, কিন্তু নিজের কাছেই যেন তার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অবসর সময়ে সে দুলারীর কাছে বসে নানান্ কথা বলে। আজকাল সে মহল্লায় মহল্লায় যায় গণেশের বন্ধুদের কাছে, তাদের সঙ্গে কারখানা কোম্পানী নিয়ে নানান কথা আলোচনা করে, আস্তে আস্তে সে এখানকার মজুর সংগঠনের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। যেন জলে জল টেনে যাওয়ার মত সে এক জোয়ারের তরঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলছে। শুধু তাই নয়, তাকে না হলে আজকাল আসর বৈঠক জমে না। গোবিন্দের চরিত্রটা অনেকের কাছে আজ আদর্শ-স্থানীয় হয়ে উঠেছে। এই সব কারণেই আরও বিশেষ করে বস্তির মামলাটা যেন এ এলাকার সমস্ত বস্তিবাসীদের জয়-পরাজয়ের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। শেষ নেই আলোচনা-বিলোচনার। এমন কি যেচেও অনেকে জিজ্ঞেস করে, মামলাটা চালাতে পয়সাকড়ি কিছু লাগবে কি না। এ সমস্ত কথাই সে এসে বলে দুলারীকে। কিন্তু ভাল করে তাকাতে পারে না দুলারীর দিকে। কোথায় যেন খচ করে বাজে, নিজেকে নিয়ে আজ তার বড় ভয় হয়।

দুলারী আজকাল কলে হাজিরা দিচ্ছে আবার। আবার কাজ ধরেছে। গোবিন্দকে কাছে পেলে খুশী হলেও তার কেমন যেন আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো ভাব। সে হঠাৎ হাসে, হঠাৎ রাগ করে। কিংবা গোবিন্দ একটু কড়া কথা কিছু বললেই কেঁদে ফেলে। কোন কোন সময় গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে তার বান্ধবীর বুক মুচড়ে ওঠে, মানুষটা যেন দিনকে দিন কি হয়ে যাচ্ছে। তারপর কি এক বিচিত্র চিন্তায় মন তার কোন অতলে হারিয়ে যায়, যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে নিজের দিকে। পরমুহূর্তে রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে গোবিন্দকে বলে, হটো তুমি, আজ আমি পাকাব।

সময় পেলেই সে আজকাল রান্নার কাজটা নিজের হাতে নিয়ে নেয়।

শীত যায়, বসন্ত আসে। মিঠে মিঠে হাওয়া বয়। রাত্রির আকাশ ভরা তারা। পূর্বে কর্ড রোডের বন গাছপালা সরসরিয়ে হাওয়া ছুটে আসে। রেল লাইনের ওপাশ থেকে মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা ফেলা ধাপা থেকে বয়ে আসে দুর্গন্ধ।

শীতের শেষে আবার উঠোন জুড়ে আড্ডা বসতে আরম্ভ করেছে। বৈজু চামার প্রত্যহ পাঠক ঠাকুরের মত রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীর আসর বসায়। হাওয়ায় লম্ফ আর ফেসোর শিষ্গুলি সব সময় অস্থির।

সব ভোলা রসিকের হারমোনিয়মটার বেলো ফেটে গিয়ে পোঁ পোঁর চেয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দই বেশী শোনা যায়।

এর মধ্যে শুরু হয়ে গেছে শিশুদের যোগেড়ী নাচ আর দুর্বোধ্য ভাষায় খেমসা গান। অর্থাৎ এ হল পশ্চিম প্রদেশগুলোর হোলির আগমনী উৎসব। একটা ছেলেকে মেয়ে সাজায়, ভাঁড় বেশে সাজায় একটি পুরুষকে, ঝুমুরের ঝুম্ঝুম্ শব্দে সে টগ্বগ্ করে ছোটে আর গায়। কিন্তু শিশুদের নকল ঘোড়া নেই, দোসরদেরই একজনকে ঘোড়া সাজতে হয়।

সেই রুগ্ন ছেলেটি তাকিয়ে দেখে। সে প্রায় অথর্ব হয়ে গেছে তবুও যোগেড়ীর ঘোড়সওয়ারকে দেখে আপন মনে বলে ওঠে ঃ

মাকি সায়েব, মাকি সায়েব, বিলেত চলেছে,
ডানা কাটা পরী মেম, সঙ্গে চলেছে।

বাপটা তার বেকার হয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেছে। মা সারা দিন কুড়োয় কয়লা গোবর, এখানে সেখানে ছোটে কাজের সন্ধানে। এখন সে বেশীর ভাগ সময় একলা থাকে। কখনো ফোটুন্টি চাচাকে পেলে আরম্ভ করে প্রাণ ভরে গল্প।

সেই বুড়োটে গম্ভীর গলাটা কি রকম নিস্তেজ হয়ে এসেছে। কখনো জয়দেবের কৃষ্ণগাথা, কখনো তুলসীদাসের রামায়ণ সে একঘেয়ে সুরে বলে যায় আর ঈশ্বরের প্রতি দুরন্ত অভিমানে ভরে ওঠে তার গলা। আর নেই নেই শব্দে দিগন্ত মুখরিত। এটা নেই, সেটা নেই করে

প্রত্যহ ঘরে ঘরে ঝগড়া লেগেই আছে। ছাঁটাই হওয়া ঘরগুলোর দিকে তাকানো যায় না।

শুক্রবারের রাতটা নিঝুম হতে একটু সময় লাগে। হপ্তার দিন, দিন দেনা পাওনার, হিসেব নিকেশের।

এইদিন মাদারি খেলোয়াড় তার দিনের শেষে খেলা দেখায় বস্তির উঠোনে। সপ্তাহান্তে, আমোদ আহ্লাদের সময়, খেলাটা জমে যায়, কিছু পাওনাও হয় মাদারি খেলোয়াড়ের।

রাত হয়ে গেছে। গোবিন্দ আজকের মত রান্নাঘর বন্ধ করে ঘরে যেতে গিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল। বেড়ার ফাঁকে দেখল, মাদারি খেলোয়াড়ের ঘরে আলো জ্বলছে। কি মনে করে গোবিন্দ উঁকি দিল বেড়ার ফুটো দিয়ে। ভিতরের দিকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে রইল সে।

দেখল ছেড়ে দেওয়া সাপ দুটো মাদারি খেলোয়াড়ের গায়ের উপর বার বার উঠে আসছে। খেলোয়াড় নিজে তার রোজকার ফ্যান একটা থালায় ঢেলে খানিকটা নুন মিশিয়ে আঙুল দিয়ে নাড়তে লাগল। অমনি সাপ দুটো কিলবিল করে তার গায়ের থেকে নেমে মুখ দিতে গেল ফ্যানের থালায়। সাপ দুটোর মুখে থাবড়া দিয়ে ফিসফিসিয়ে উঠল সে, ইস্টাপ্...ডারলিন্, নট্ নাউ।

সাপ দুটো অপলক চোখে থালাটার দিকে তাকিয়ে কেবলি চেরা জিভ বার করতে লাগল আর খেলোয়াড় থালাটা তুলে এক নিশ্বাসে কোঁত কোঁত করে খেয়ে ফেলল অনেকটা ফ্যান। তারপর থালাটা নামাতেই সাপ দুটো হুমড়ি খেয়ে পড়ল থালার উপর।

সে একটা আরামের শব্দ করে বলে উঠল, নট্ ফ্যান...ইসকো বোল্তা মিল্,...দুধ। বলে আপন মনে হিহি করে হেসে উঠল, বলে সবাই, সাপে খায়! ছ্যাটাজ ফোরটুয়েন্টি...হি হি...।

লম্ফের আলো আঁধারিতে যেন লোকটাকে চিনতে পারছে না গোবিন্দ। তার নিজের পেটের মধ্যে যেন কি একটা পাক খেয়ে উঠল। ওহো! তাই মাদারি খেলোয়াড় বার বার ফ্যানের কথাটি

বলতে ভোলে না। রোজকার পাওনা খাবারে পেট ভরে না তার। তাই, তাই!

পরদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে খেলোয়াড়ের ফ্যানের পাত্রটিতে ফ্যান রাখার সময় গোবিন্দ এক দলা ভাত তার মধ্যে ফেলে দিয়ে বলল, যা শালা, খুব কষে আমাদের ফোরটুয়েন্টি কর্।

রাতের নিরালায় ফ্যান ঢালতে গিয়ে ভাতের দলাটা দস্ করে পড়তেই চম্‌কে উঠল খেলোয়াড়। বিকৃত মুখে সন্দেহ ভরে আঙ্‌ুল দিয়ে নেড়ে চেড়ে যখন দেখল ভাত তখন সে নিঃশব্দ উল্লাসে মুখ ব্যাদান করে ফেললে।—ভাত—রাইস্? আই সি!

বলে ভাতগুলো আলাদা করে নিয়ে অস্থির সাপ দুটোর দিকে বাড়িয়ে দিল ফ্যান, বলল, নে হারামজাদীরা, আজ খুব করে খা।

তারপর হেসে উঠে বলল, ফোরটুয়েন্টি মাদারিকা কানা চিড়িয়া বন্ গয়া। মেরা মাদারি! রোজ ওকে এমনি কানা করে দিও।

বুঝি মাদারির গুণেই গোবিন্দ রোজই কানা হয়ে যেত। কেবল নিজে খাবার সময় এ সংসারের উপর, নাকি নিজের উপরই তার রাগে ভরে উঠত মনটা।

মাদারি খেলোয়াড়ের কথাটা দুলারীকে বলবে মনে করে সন্ধ্যার একটু পরে গোবিন্দ ঘরে ঢুকে দেখল দুলারী একেবারে একলা চুপচাপ বসে আছে। কারখানার কাপড়টাও ছাড়েনি। গোবিন্দকে দেখে একটু চমকে উঠল সে। এমনি চমকায় সে আজকাল। হাসে, কথা বলে, হঠাৎ চমকে যায়। গোবিন্দ বলল, কি ভাবছ একমনে? দোস্তের কথা?

দুলারী হঠাৎ বলে উঠল, থাক্ তার কথা বল না তুমি।

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল গোবিন্দ, কেন?

দুলারী হঠাৎ কেমন হয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার সঙ্গে বসে বসে এত বাত্ তোমাকে করতে হবে না।

গোবিন্দ একেবারে দিশেহারার মত দু-পা এগিয়ে এসে বলল, কেন দোস্তানি?

দুলারী মুখ ফিরিয়ে বলল তীব্র গলায়, তুমিই তো বেচারীকে উস্‌কানি

দিয়ে জেলে পাঠিয়েছ জানি না, না ?

গোবিন্দ নির্বাক, নিথর।

দুলারী একেবারে তিক্ত গলায় হিসিয়ে উঠল, ওকে জেলে পাঠিয়ে তুমি আমাকে—আমার সঙ্গে মহব্বত ফাঁদতে চাও, জানি না ভেবেছ ?

গোবিন্দের মনে হল সে অন্ধ হয়ে গেছে, বোবা হয়ে গেছে, কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছে, কে যেন গরম শিক দিয়ে তাকে খোঁচাচ্ছে। সে যন্ত্রণায় ফিস্‌ফিস্‌ করে উঠল, দোস্তানি···দোস্তানি।

বলতে বলতে সে ছুটে বেরিয়ে গেল।

দুলারী চকিতে মুখ তুলে ডাকতে গেল গোবিন্দকে। কিন্তু তার আগে গোবিন্দ উধাও। দুলারী দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে উঠল কান্নায়।—না না···।

সম্বিৎ নেই গোবিন্দের। চলছে, যেন নিজের পায়ে নয়। একবার ভাবল মহল্লার দিকে যাবে। কিন্তু মোড় ফিরে নিউ কর্ড রোড পেরিয়ে, পূবের ঝোপে ঝাড়ে ছাওয়া অন্ধকার পথে রেল লাইনের দিকে এগিয়ে চলল। চলল যেন নিশি পাওয়া অচেতন মানুষের মত। অবশ, বিহ্বল। হুস্‌ হুস্‌ করে দানবীয় শব্দে ছুটে আসছে একটা রেলগাড়ি দক্ষিণ দিক থেকে।

গোবিন্দের চোখের উপর ভেসে উঠল পূবের এই নাক বরাবর রাস্তাটা।···নীলগঞ্জ···বারাসত···বসিরহাট···ইটিণ্ডেঘাট···ইচ্ছামতী! নোনা কালোবরণী ইচ্ছামতী মানুষের মনের ইচ্ছা পূরণ করেছে।··· ওপারে মুখ থুবড়ে পড়া ছুতোরের ঘর, ছুতোর বউ, মাটি মাখা হোঁতকা ছেলে, ছোট বিনুনির চুড়ো বাঁধা মেয়ে, আর···

গাড়িটা এসে পড়েছে, ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌···। কে ? চোখের সামনে ভেসে উঠল অনেকগুলো মুখ। বাড়িওয়ালা, কালো, ফুলকি, নগেন, রুগ্ন ছেলেটা, গণেশ, ছাঁটাই, মামলা···দুলারী! মামলা!··· মামলা!···

ঘং করে একটা শব্দের সঙ্গে লাইনের গেটটা একবার ককিয়ে বন্ধ হয়ে গেল।

কে ? ফোরটুয়েন্টি ? দুটো লোক দাঁড়িয়ে পড়ল।

গোবিন্দ খানিকটা যেন বিস্ময়ের ঘোরে লক্ষ্য করল, দুটো ভিন্ মহল্লার লোক।

রেল এঞ্জিনের উত্তপ্ত হাওয়া ঝাপটা মেরে গেল চোখে মুখে।

কোথায় চলেছ রাত করে ? একজন জিজ্ঞেস করল।

গোবিন্দ বলল, এমনি, ঘুরতে।

লোক দুটো হো হো করে হেসে উঠে তার হাত ধরে শহরের দিকে এগুলো। বলল, পাগলা।···হ্যাঁ, ফোরটুয়েন্টি, মাগ্গি ভাতা আদায়ের পিলানটা তুমি যা বাতলেছ, সেটাই—

লোক দুটো বক্‌বক্ করতে লাগল নানান্ কথা।

একটা নিশ্বাস ফেলে বস্তির মধ্যে ঢুকল গিয়ে গোবিন্দ। সকলে খাওয়ার অপেক্ষা করছে তার জন্য। থালা নিয়ে ভিড় করেছে সবাই রান্নাঘরের দরজায়। চিৎকার করে ডাকছে ফোরটুয়েন্টিকে।

মনের মধ্যে একটা ভাবনা কেবলি আনাগোনা করতে লাগল, মাছ ডাঙায় উঠলে মরে। এ সংসার ছেড়ে মানুষ কোথায় খুঁজবে মুক্তি। আজ তাকে মিথ্যা সন্দেহ করেছে দুলারী। অপমান করেছে। মানুষ যখন তার প্রাণ-ধনের অদর্শনে ব্যাকুল হয়, তখন যে তার সব সত্যি মিথ্যে একাকার হয়ে যায়। নিজেকে নিয়ে সে ফাঁপরে পড়ে। দিক-পাশ জ্ঞান থাকে না। দুলারী পুড়ছে। পুড়ে পুড়ে সোনা হবে। সেইদিন সব সংশয়, সব মিথ্যা দূর হয়ে দেখা দেবে সত্য। সে সত্য অনেক দূরে হয়তো। তা' বলে মৃত্যু-শক্তি ! ছি ছি ! ছিঃ !

বেলা এগারটা। গোবিন্দ বসে আছে বাইরের রকে। বাড়িওয়ালা বসে রয়েছে পাশে। গোবিন্দ তাকে বোঝাচ্ছে মোকদ্দমার আসল অবস্থাটা।

ঠিক এ সময়েই এল ফিটফাট বেঁটে বিরিজমোহন। সঙ্গে একটা ডাক-ঘরের পিওন।

এই যে বাবুসাহেব, জয় গোপালজী। এ পিওনটা আপনার দৌলত-খানা খুঁজছিল, তাই দেখাতে নিয়ে এলুম।

পিওনটা একটা খাম আর পেন্সিল বাড়িয়ে দিয়ে একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে সই করতে বলল।

বিরিজমোহন বলল, বাবুসাহেবের আঙ্গুলে কালি লেপে দাও, টিপসই দেবেন। মানে উনি আবার—

বাড়িওয়ালা প্রথম মুখ খুলেই বলল, আমি কোন শুয়োরের বাচ্চার মত মুরুখ নই। বলে বড় বড় অক্ষরে খাপছাড়া ভাবে সই করে দিল। চিঠিটা একটা হিন্দী ভাষায় নোটিস্—ঠিক মেয়াদ আগামী তিন মাসের মধ্যেই শেষ হবে। তার মধ্যে যেন জমি খালাস করে দেওয়া হয়।

বিরিজমোহন ব্যাপারটা জেনেই চোখ পিটপিট করে পকেট থেকে সেই রাংতার মোড়ক খুলে সিদ্ধি বের করে বলল, বাবুসাহেব?

বাড়িওয়ালা বলল, চোরের মালে থুক দিই।

বিরিজমোহন নিজে একটি গুলি গিলে বলল, হ্যাঁ বাবুসাহেব, আপনার এখানে যে খুব একটা চালু ছোকরা আছে, ফোরটুয়েন্টি নাম। সবাই তার কথা বলে, কিন্তু আমি তো চিনিনে।

নিশপিশ করে উঠছে বাড়িওয়ালার হাত পা। খেঁকিয়ে উঠল, কোন জুয়াচোরই ওকে চেনে না।

বিরিজমোহন হেসে বলল, আপনি চটে যাচ্ছেন বাবুসাহেব। কিন্তু আমি ভালো মনেই বলছি তা সে চারশো বিশ আপনার মামলাটা কি রকম চালাচ্ছে।

মুহূর্তের জন্য গোবিন্দ ভুলে গেল অন্য সব কথা। লোকটার নিষ্ঠুর ভাঁড়ামি সে সহ্য করতে পারল না। কাছে উঠে এসে সে বলল, কী দরকার আপনার?

তুই কে রে? লোকটা দাঁত খিঁচোল।

আমি যে-ই হই, তোমার আর কি বলার আছে? শক্ত হয়ে উঠেছে গোবিন্দের হাত। কিন্তু বিরিজমোহন বাড়িওয়ালার দিকেই ফিরে

বলল, তাহলে আপনার পাকা মোকামের পিলানটা—

রসিকতাটুকু শেষ না হতে থস করে এক গাদা গোবর বিরিজমোহনের গিলে করা পাঞ্জাবীর বুকে এসে পড়ল যেন একটা পাল্টা রসিকতার মত। মুহূর্তে ক্ষেপে বারুদ হয়ে উঠল বিরিজমোহন, কোন্ শালা রে? বলতেই খানিকটা কাদা এসে পড়ল তার নাকে মুখে।

বাড়িওয়ালা হা হা করে হেসে উঠল। বলে উঠল, আরে ছি ছি, কেয়া বাত্। হোলি আ গয়া?

বিরিজমোহন লাফিয়ে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে খিস্তি করতে লাগল। কিন্তু গোবর কাদার বৃষ্টি থামল না।

বিরিজমোহন যখন ছুটে পালাতে বাধ্য হল, তখন সদী বুড়ি বেরিয়ে এল বস্তির ভিতর থেকে হাত ভরা কাদা গোবর আর একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে। ছেলেমেয়েগুলির হাত ভরতি কাদা গোবর।

কিন্তু বাড়িওয়ালার মুখে আর একটুও হাসি নেই। সে বলল, ফোরটুয়েন্টি, তা হলে মামলাটা একেবারে ধোঁকা দিচ্ছিস্ আমাকে।

গোবিন্দ স্তম্ভিত, নির্বাক। বুঝি তার প্রতি সকলের অবিশ্বাস ও অপমানেরই পালা পড়েছে আজকাল। বাড়িওয়ালা বলল, কথা বলছিস্, না যে? এতদিন যে মামলা খরচের পয়সা নিয়েছিস্, সে সব—তা—হলে—

গোবিন্দ যেন জ্বলে উঠল, বলল, সত্যি তুমি মুখ্যু, যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা বল না।

বলে সে সেখান থেকে সোজা মাঠ ভেঙে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আশ্চর্য! কোথা থেকে কি হয়ে গেল। বাড়িওয়ালা নিজের কপালটা চাপড়ে বারবার বলতে লাগল, কেবলি ঠকতে জন্মেছি এ জীবনে, কেবল ঠকতে।

চাঁদ উঠেছে।

ফাল্গুনের হাওয়া মাতাল। সে হাওয়ায় ভেসে আসছে পেপার মিলের দুর্গন্ধ। বস্তিটাকে মনে হয় দেওয়ালের একটা বেড়া। চালার খোলাগুলো রোদে জলে কালো হয়ে দেখাচ্ছে যেন সারি সারি ময়াল সাপের রেখা। চাঁদের আলোয় নর্দমার পাঁকে কি যেন ঝিকমিক করে নড়ে। মাতাল বাতাসে তার গন্ধ উঠে আসছে।

উঠোনে বসেছে ছোট ছোট আসর। হারমোনিয়ামের শব্দ শোনা যাচ্ছে প্যাঁ···পোঁ···। অনেকগুলো গলার গান শোনা যাচ্ছে একসঙ্গে। তার মধ্যে মিশে গেছে সেই বুড়োটে গলার গান, কোন ঘরে ঝগড়া চল্‌ছে, কোন ঘরে হাসি, কেউ বা কাঁদছে।

একদল বাচ্চা খেলা করছে উঠোনে।

সেই রুগ্ন ছেলেটা রকে চিৎ হয়ে শুয়ে হাঁ করে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে, তার পাশে বসে আছে গোবিন্দ। ওর মা গেছে গোবিন্দকে বসিয়ে কোথায় কোন্ কুঠিতে, কাজের জন্য। ছেলেটার গায়ে অসহ্য জ্বর। ওর তাপে মাটি তেতে উঠেছে। গোবিন্দ আজকাল যেন খানিকটা একঘরে হয়ে গিয়েছে। বাড়িওয়ালার সঙ্গে তার খুবই কম কথা হয়। তাও হয়তো হত না, যদি না সে একটা অর্ডার পেত কোর্ট থেকে। সেই অর্ডারে ছিল, মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত জমি বর্তমান দখলকারীর দখলেই থাকবে।

গোবিন্দ ছেলেটার গায়ে হাত দিয়ে দেখল একবার, জ্বরটা যেন কমছে একটু।

ফিসফিস করে ডাকল ছেলেটা, ফোটুন্টি চাচা!

বল বাবা।

মাকি সাহেব।

কোথা?

ছেলেটা একদৃষ্টে চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল। গোবিন্দও তাকাল চাঁদের দিকে। পূর্ণ চাঁদ যেন আকাশের কোল জোড়া সোনা।

ছেলেটা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'উ-ই'যে। চাঁদের মধ্যে হাঁটছে, খট্ খট্ খট্। মাকি সায়েব বলছে, হেঁয়ো ছোক্‌রা, আও আও। আমি

যাব।

গোবিন্দ সেই ফিসফিসানি শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেল। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল চাঁদের দিকে। যেন সেও দেখতে পাচ্ছে মাকি সায়েবকে। ডাকছে আও আ-ও।···

ছায়া ঘিরে এল যেন চাঁদে। দৃষ্টিটা কোথায় হারিয়ে গেল গোবিন্দের।

তুলারীর সঙ্গে তার একেবারেই কথা নেই। কখনো মুখোমুখি দেখা হয়, হয়তো তুজনেই থম্‌কে দাঁড়ায়। একজন অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে নীরবে। ভুলেও চোখাচোখি করে না। যেন, আরো যদি কটুকথা বলতে চাও, বল। আজকে যে শুধু মেঘ। মেঘ ও অন্ধকার। আর একজন অপলক চোখে তাকায়। ঠোঁট কাঁপে থর্‌থর্‌ ক'রে। ভ্রূজোড়া ওঠানামা করে। জ্বলে ওঠে বুক। কিছু যেন বলতে চায়। বলতে চায় পারে না। মুখে আঁচল চেপে চলে যায়। ভাবে, ওরা যে পুরুষ। মরদ! নিরেট পাথর, নিষ্ঠুর ক্ষমাহীন!

এমনি নীরবে দেখা আর চলে যাওয়া।

গোবিন্দ এখানকার কাজটুকু শেষ করেই বাইরে চলে যায়। সারা দিন কোথায় কোথায় ঘোরে। বস্তিতে কোন সময় দেখা যায়, ঝি-বহুড়িদের কাজের ফাঁকে সে তাদের বাচ্চাদেরও কোলে করে রাখে, এর তার খুঁটিনাটি কাজ করে দেয়। বাইরের থেকে মনে হয়, বস্তি-টার কোনই বুঝি পরিবর্তন হয়নি। তবু ঠিক যেন আগের মত নেই!

ফুলকির সঙ্গে কালো সেই যে চলে গেছে, আজ অবধি আসেনি। গোবিন্দ শুনেছে ফুলকির কি একটা কালরোগ হয়েছে, অথর্ব হয়ে গেছে। কেউ ছোঁয় না কালো ছাড়া। কালো খাওয়ায়, রোগের সেবা করে। এইবারটি যে তার শেষবার, সে বলেছিল। জানটা যে তার কাছে সস্তা নয়!

একটু পরেই রুগ্ন ছেলেটার মা এল। এসেই ছেলের গায়ে হাত দিয়ে চিৎকার করে উঠল, হায় রাম রাম—একি গোভূতের কাছে

ছেলেটাকে রেখে গেছি গো!

গোবিন্দ একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। বলল, কী হয়েছে মা?

মা তেমনি ভাবেই বলল, বলে কি গো চোখ খেগোটা? বাছা যে আমার মরেছে।

বলে সে তার ছেলের মুখ থেকে হঠাৎ জ্যান্ত কয়েকটা কৃমি টেনে বার করে ফেলল। কিন্তু ছেলেটা তখন মরে গেছে। যেন অবাক ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে আছে চাঁদের দিকে। তার চোখের মণির অতলে চলে গেছে চাঁদের কণা।

জ্যোৎস্নায় কীটগুলো কিলবিল করছে। সবাই এসে দাঁড়াল সেখানে। মা তার একটানা গলায় কাঁদতে লাগল, ওরে বাবা···মাকি সায়েবের বিলেত দেখা তোর যে হল না। এমন যমের কাছেই তোকে রেখে গেছ্‌লাম।

নির্বাক হতভম্ব গোবিন্দের দিকে সবাই এমনভাবে তাকাল যেন সত্যি যম দেখছে।

চাঁদ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বস্তিটার দিকে।

কে একটা বহুড়ি শিউরে উঠে গোবিন্দকে দেখিয়ে বলল, হায় রামজী! ওর কাছে আমার বাচ্চাকে দিয়ে আমি আমার কাজ করি। আর কভি নয়।

দুলারীও সকলের আড়াল থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে গোবিন্দের দিকে। হঠাৎ তার বুকটা কেমন টন্‌টন্‌ করে ওঠে ওই হতভম্ব মুখটার দিকে চেয়ে। কি যেন ঠেলে আসে গলার কাছে। কিন্তু কিছু না বলে সে তাড়াতাড়ি ঘরের অন্ধকার কোলে মিশে যায়।

হাওয়া মাতাল হয়েছে। মাতাল হয়ে উঠছে বস্তি। এবার ফাগুয়া পড়েছে চৈত্র মাসের একেবারে শেষে, বৈশাখের লাগোয়া।

কাজের অবসরটুকু ঢোল করতাল ও গানের শব্দে মুখরিত। কারো খেয়াল নেই যে-কোন মুহূর্তে তাদের এখান থেকে উঠে যাওয়ার হুকুম

আসতে পারে।

গোবিন্দের মন অস্থির, কিন্তু ধীর। মামলার শেষ শুনানীর দিন এসে পড়েছে। আর মাত্র মাস খানেক বাকী। এটা শেষ না হলে সে বিদায় নিতে পারছে না।

বাড়িওয়ালা যেন হতাশায় ভেঙে পড়েছে। সে গোবিন্দকে শুনিয়ে শুনিয়েই সবাইকে বলছে, তল্পি গোটা সব···আর আমার কাছে তোদের রাখতে পারলাম না।

গোবিন্দ বোঝে, এ শুধু তার উপর রাগ নয়। বাড়িওয়ালার জীবনের সব শেষের আশা ধূলিসাৎ হওয়ার যন্ত্রণা।

উকিলের কাছে বারবার গিয়েও কোন আশা পাচ্ছে না গোবিন্দ। একবার ভেবেছিল, এ বাড়ির সবাইকে নিয়ে সে একটা ডেপুটেশন যাবে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। কিন্তু তাতে মামলার ফল রোখা যাবে না। একদিন উকিল বলল, গোবিন্দ, তোমাকে ভালো জানি, তাই বলছি। তোমাদের বস্তিটার উপর দেখছি পুলিশেরও নজর আছে। মহকুমা হাকিমের কাছে থানার বড়বাবু একটা প্রাইভেট্ রিপোর্ট পাঠিয়েছে। সুপারিশ করেছে উচ্ছেদের।

গোবিন্দ বলল, বাবু, ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে একবার বস্তিটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিন···।

উকিল জিভ্ কেটে বললেন, মাথা খারাপ! এত বোঝ তুমি, এটা বুঝলে না? তা হলে প্রমাণ হয়ে যাবে. আমি থানার চিঠির সংবাদটা যোগাড় করেছি। আমাকে আর প্র্যাকটিস্ করতে দেবে না তা'হলে এসব কাজ ভেতরে ভেতরে চলছে। তোমাদের শত্রু বড় শক্ত।

কিন্তু গোবিন্দ যেন ইহজগতে নেই। সে পাগল হয়ে গেছে। প্রায় পাগলের মতই কেবলি গোবিন্দ ছোটে উকিলের বাড়িতে। আবার একদিন উকিল বলল, দেখ, আমার যা করার করব। তুমি যদি একটা ব্যারিস্টার আনতে পার, তা হলে খুব ভালো হয়।

গোবিন্দ একেবারে ভেঙে পড়ল, ব্যারিস্টার কোথা পাব বাবু?

উকিল বলল, তোমাকে আমি একটা ঠিকানা দিচ্ছি কলকাতার। সে ঠিকানায় গিয়ে তুমি যদি সব বলতে পার, তাহলে সে বিনা পয়সায়ও আসতে পারে। লোকটা গরীবের বন্ধু। পারবে যেতে?
পারব, বলল গোবিন্দ। কি না পারে সে। এখন যা বল, তাই। প্রাণ বল, সেটাও তুচ্ছ হয়ে গেছে।
তিন দিন গোবিন্দের কোন দেখা নেই।
বাড়িওয়ালা সকলের সামনে বসে বসে তাকে খিস্তি করছে, গালা-গালি দিচ্ছে। ফোরটুয়েন্টির কাণ্ড দেখে সবাই অবাক হয়েছে। লোকটা গেল কোথায়। মামলার শেষ দিন যে ঘনিয়ে আসছে। সমস্ত এলাকায় মহল্লাতেও তার কোন পাত্তা নেই।
তিন দিন পরে দেখা গেল, রুগ্ন ক্ষীণজীবী উসকোখুসকো গোবিন্দ এসে আবার হাজির হয়েছে। সবাই তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল, কিন্তু কোন কথা বলল না।
গোবিন্দও কোন কথা না বলে, নিজের কাজে লেগে গেল আবার স্বাভাবিকভাবে। কাজের শেযে সারাদিন বাইরে থাকে। বাড়িওয়ালা কিছু বললে বলে, একটা কাজ খুঁজছি কারখানায়।
এ চৈত্র হাওয়াতে বুঝি দুলারীর বিরহ আর বাধা মানতে চায় না। সে বারবার পা বাড়ায় গোবিন্দের কাছে যাওয়ার জন্য। সে খুলে বলতে চায় তার বদ্ধ হৃদয়ের সমস্ত কথা। একবার গোবিন্দের মুখে তার জেল-বন্দী বন্ধুর নামটি শুনতে চায়। একটু ভরসা চায়। সে বলুক, দোস্ত আমার ভাল আছে গো দোস্তানি। সে এল বলে। এই বলে গোবিন্দ হাসুক, হেসে তাকে কাঁদাক। আর দুলারী এ বস্তির মানুষগুলিকে একবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিক, গোবিন্দ কাউকে ফাঁকি দিতে চায়নি, ঠকায়নি, সে যম নয়। কিন্তু দুলারী তাকে আড়াল থেকে দেখে, কখনো কাছে আসতে পারে না। গোবিন্দও দেখে কিন্তু সেটা যেন স্থবিরের চাউনি। তাতে কোন ভাব নেই, বোধ নেই। তার বোবা বুকে কি কথা লুকানো আছে, কেউ তা জানতেও পারে না।

বুঝি সে সত্যিই যম হয়েছে, এমনি নির্বাক হয়ে সে সবাইকে দেখে। কেবল সদী বুড়ি আর মাদারি খেলোয়াড়ের সঙ্গে সময় পেলেই বক্‌বক্‌ করে। রান্নার কাজটা আজকাল তার আর কিছুতেই জমে না। তুলারীও আসে না সাহায্য করতে।

একদিন সে একটা মস্তবড় গর্ত খুঁড়ে দিয়েছে বাচ্চাদের পায়খানার জন্য। মায়েরা যতই আগলাক, ফোটুন্টি চাচাকে কেউ ছাড়তে পারে না।

এর মধ্যেই একদিন রাতে খাওয়ার পর মাদারি খেলোয়াড় চেঁচিয়ে উঠল, হ্বাটাজ কোল্‌ ফোরটুয়েন্টি কা খেল্‌। দেখ একবার শালার কাজ। হিয়ার···ফ্যান উইথ্‌ রাইস···শালা রোজ এমনি ভাত নষ্ট করে মাইরি।

বলে সে ফ্যানের ভেতর থেকে এক দলা ভাত তুলে ফেলল। মানুষ কি বিচিত্র! কি বিচিত্রতর তার মন; বুঝি মাদারি তার এ মুহূর্তের মনের চেহারাটি নিজেও চেনে না।

সবাই একযোগে গোবিন্দের হতবাক মুখটার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল—

শালা ফ্যান ঢালতে জানে না।

কে বলল, তাই আমার ভাত রোজ কম পড়ে।

আর একজন বলল, মাইরি, আমারও পেট ভরে না।

এক দলা ভাতের জন্য হঠাৎ সকলের ক্ষুধার অভিযোগ হুড়মুড় করে ঝরে পড়ল। কিন্তু গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে মাদারি খেলোয়াড়ের মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল। ভাতগুলো চটকাতে চটকাতে সে বিড়বিড় করে উঠল, ব্যাড্‌···তুনিয়া···আই ফল···ডেম্‌ ইস্টাপেড্‌···আমি-আমি।

গোবিন্দ চুপ করে রইল তবু। তার চোখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে এল মাদারি। পারল না, কেবল ব্যাগপাইপে ফুঁ দেওয়ার মত তার গলার শিরগুলি ফুলে উঠল।

গোবিন্দের চোখের উপর ভেসে উঠল, মাদারির ফ্যান ছেঁকে সেই

ভাত খাওয়ার কথা। আর আজ সে কাকে ফোরটুয়েন্টি করল, কে জানে। তার বিশ্বাস কাঁপতে লাগল থর্‌থর্‌ করে।
দুলারীর কথা সে ঠিক ভেবেছিল। দুর্দিনে সংশয় ও অবিশ্বাস মেঘে ঢাকা পড়েছে। কিন্তু মাদারির বেলায়ও যে তা-ই সত্য, এটুকু তার মনে রইল না।

সন্ধ্যার ঘোর আঁধারে গোবিন্দ কালোকে দেখতে গেল একবার। হয় তো কালোও বিরূপ হয়ে আছে আজ তার প্রতি।
অন্ধকার অলিগলি দিয়ে একটা প্রকাণ্ড বস্তির সামনে এসে দাঁড়ালো সে। বিরিজমোহনের অনেক বস্তি। এটি তার মধ্যে একটি। বস্তির মধ্যে ঢুকে একটু বিপদে পড়ল সে। কালোর ঘর চেনে না। কাউকে জিজ্ঞাসা করাও মুশকিল এমনিতে কারুর খেয়াল নেই। যে খুশি সে যাচ্ছে আসছে। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। এ বস্তি আরো নোংরা ও ভয়াবহ। উঠোনের বুকে আদিকালের পাঁক ও নোংরা-পুকুরের মত ছড়িয়ে আছে। পা বাড়ালে হাঁটু অবধি ডুবে যাবে। গোবিন্দকে যদি কেউ চিনতে পারে ক্ষতি নেই। বিরিজমোহন টের পেলে শ্রীঘর চালান দেবে।
হঠাৎ কে যেন তার কানের কাছে বলে উঠল, ফোরটুয়েন্টি। গোবিন্দ চমকে তাকিয়ে দেখল, নয়াবাড়ি কারখানার একজন মজুর। লোকটা খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল। হাত ধরে দাওয়ায় নিয়ে তুলল তাকে। এদিক ওদিক ক'রে আরো অনেকে এসে ঘিরে বসল তাকে। সকলেই গোবিন্দের নতুন পরিচিত। সকলেরই জিজ্ঞাস্য, বস্তির মামলাটার কি হল? তোমরা জিততে পারবে তো? কেউ বলল, বিরিজমোহন শালা দিনরাত ফন্দি খাটাচ্ছে। বাঙ্গালি জমিদারবাবুও হাত মিলিয়েছে ওর সঙ্গে।
মগর হাঁ, আলবাৎ তুমি ফোরটুয়েন্টি। তোমাকে ওরা উকিল, ব্যারিস্টার, সরকার খিলাপ-আদমি, যা খুশি তাই ভাবছে। তোমার

কথা ভেবেই ওদের শালা মাথা খারাপ হয়ে গেল।

সকলেই জানতে চায়, জিত্ হবে কিনা। তারা বিরিজমোহনের পরাজয় চায়। জিত্ চায় গোবিন্দের। গোবিন্দ খালি বলল, ওদের আইনের কাজ। আইনের ফয়সালায় যা হয়, তাই হবে। ভাঙ্গা বেড়া, ফুটো ঘর, কে চায় বল? কিন্তু উচ্ছেদ করলে আমরা মাথা গুঁজব কোথায়?

এ অঞ্চলের সর্বত্রই নয়াসড়কের বস্তির কথা। সকলের মনে উত্তেজনা, রাগ ও ঘৃণা। সকলেই অপেক্ষা করছে ফলাফলের জন্য। যেন আর একটা মস্ত বড় ছাঁটাই আসন্ন।

তারপর গোবিন্দকে তারা কেউ বিড়ি দিল। ভাল করে বানিয়ে দিল খৈনী। খাওয়ার নেমন্তন্ন করল অনেকে। চা দিল খেতে।

গোবিন্দর বুকের মধ্যে একটা নিঃশব্দ কান্না গুমরে উঠতে লাগল। এ আপ্যায়ন সে পেয়েছিল ওখানেও। কিন্তু কি হল সেখানে কি হল আজ ওদের।

সে বলল, কালোর সঙ্গে দেখা করবে একবার।

অমনি সকলের মুখগুলি রাগে ও ঘৃণায় কুঁচকে গেল। বেতমিজ, উল্লুক কালো! একটা জানোয়ার। ঘিয়ে ভাজা নেড়ি কুত্তার মত একটা রেণ্ডি হল ফুলকি, মরবার জন্য ধুঁকছে। তার সেবা করছে কালো। সেল সায়েবের মেম বিলাত থেকে এসেছে, এখন তাড়িয়ে দিয়েছে। ওর আর কি আছে। ও তো মরবে।

ঘর দেখিয়ে দিল তার। ঘরে ঢুকেই একটা দুর্গন্ধ পেল গোবিন্দ। দেখল বাতি জ্বলছে। রীতিমত দেশী হ্যারিকেনের আলো। আর সবই নোংরা। জামা কাপড় থালা বাসন যেন দলা দলা ময়লা।

কালো হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো ফুলকির গায়ে। গোবিন্দকে দেখে বলে উঠল, তুমি এসেছ? এস এস।

হাসল কালো। ফোগলা মাড়িতে, সে হাসি শিশুর মত।

ফুলকি তাকাল। লাল চোখ! খানিকক্ষণ পর বলল, ফোরটুয়েন্টি? হাসল। সেই তীব্র হাসিই যেন। বলল, এস গো এস। পরাণটা

জুড়োল তোমাকে দেখে মাইরী !

গোবিন্দ বসল গিয়ে কাছে। শুকিয়ে পুড়ে ফেটে ফেটে গেছে ফুলকির মুখের চামড়া। কুৎসিত! সামনে এসে তাকালে মনে হয়, ভয়ংকর দর্শনা রাক্ষুসী যেন। মাথার চুলগুলি উঠে গেছে, যেন চরা পড়েছে নদীর মাঝখানে। মুখটা একবার যন্ত্রণায় কুঁচকে উঠল। তারপর আবার হেসে বলল, এমনিই ছিলুম দেখতে কয়েক মাস ধরে। টের পাওনি, রং মাখতুম যে। রং মেখে সব ঢেকে রাখতুম মাইরী। আয়নাটা ভেঙ্গে ফেলেছি মুখ দেখব না বলে। কালোর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, আমি এখনো কত সুন্দরী। মাইরী, কত সুন্দরী। ইসারা করলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে বুকে। কিন্তু তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝছি, আয়না ভাঙ্গলে কি হবে। আসল আয়নায় ঠিকই দেখা যাচ্ছে।...

একটু অপ্রতিভ হল গোবিন্দ। চোখে তার ঘৃণা ফুটে উঠেছে। ঘৃণা কেন? বিস্মিত তো সে একটুও হয়নি। এতো সে জানত। জানা কথা, একদিন এই হবে। নগেনকে সে তাই বলেছিল। আজ থাকলে কি বলত নগেন।

গোবিন্দ বলল, ফুলকি, তোমাকে আমি ঘেন্না করিনে।

ফুলকি বলল, কেন করনা, তুমিই জানো। মন্দকে ঘেন্না করাই তো ঠিক।

তুমি কি মন্দ? তোমার রোগ মন্দ।

না, আমিও মন্দ। সে বুঝত তোমাদের নগেন। মন্দ না হলে সেল সায়েবের কুঠিতে যেতুম?

বলে এক মুহূর্ত চুপ করে আবার বলল, সায়েবের কুঠিতে, ঘরের মেঝেয় মুখ দেখা যায়। কি ঘর! আর কি জিনিস! সেই ঘরে আমাকে রাণী করেছিল সেল সায়েব। অমন বিছানা তোমরা চোখে দেখোনি গো কোন দিন। শুলে পরে মনে হত কোথায় তলিয়ে গেলুম মাইরী! মেমসায়েব শোয় ওখানে। পালকের বিছানা। আর মদ! সগ্‌গের অমর্ত! এক বোতলের দাম শালা দেড়শো

টাকা। কে না যেতে চায়, বল। সোম্‌সারে এত আরাম, এত সুখ, এত ভোগ ঐশ্বিয্যি···

কালো অনেকবার শুনেছে। তবু হা করে শোনে এখনো। গোবিন্দ বলল, হ্যাঁ ফুলকি, ওদের অনেক সুখ, অনেক ভোগ। তুই দুদিনের জন্যে···

না না না, ওকথা ব'লো না। ফুলকি বলে উঠল, রোগ আমাকে সায়েব দেয়নি পেত্থমে। দিয়েছে এক বাবু। ছোটখাটোতে মন উঠত না আমার। নিজের দেশ থেকে পেত্থম বেরিয়েছিলুম যার সঙ্গে, সে আমাদের পাড়ার এক কেরেস্তান মিলিটারির চাকুরে। মাদ্রাজ শহরে তার বড় বাড়ি। আমার কি মধুর বুলিতে মন ওঠে? মিছে রাগ নয় নগেনের? আমি সুন্দর খুঁজেছি, বাড়ি চেয়েছি, ঝকমকে তকতকে। পেয়েছিলুম অনেককে! সবাই চেয়ে খেয়ে ছেড়ে দিল। কি করব? ওদের রাঁড় হয়ে রইলুম চিরকাল। তোমাদের নগেন বুঝত না। ওকে ব'ল···

গোবিন্দ বলল, সে চলে গেছে।

গেছে? আবার যন্ত্রণায় কাতরে উঠল সে। কালোকে দেখিয়ে বলল, তবে একেও নিয়ে যাও।

গোবিন্দ তাকাল কালোর দিকে। কালো গোবিন্দের দিকে। দাঁতহীন মাড়িতে হেসে বলল, এমনি বলে। পাগলি। বলে সে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল ফুলকির।

গোবিন্দ গালে হাত দিল ফুলকির। মনে হচ্ছে তপ্ত লোহা। হাত পুড়ে যায়। ফুলকি চমকে উঠে বলল, ছি ছি, হাত দিও না। বিষ! একেবারে বিষ!

গোবিন্দ বলল, চিকিচ্ছের কি হচ্ছে?

কালো বলল, এখানকার ডাক্তার বলেছে, কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। এখানে কেউ সারাতে পারবে না। ও যেতে চায় না। ফুলকি এর মধ্যেও ফুঁসে উঠল, তোমার মরণ! সখ্ থাকে অন্য মেয়েমানুষ দেখোগে। কলকাতায় নিয়ে ভাল হয়ে আমি তোমার কাছে

শুতে পারব না।
কালো আবার বলল, পাগলি!
ফুলকি বলল, ফোরটুয়েন্টি দোহাই, দুলারীর মত ফোরটুয়েন্টি কর না আমাকে। ওর গণেশ আছে, তুমি আছ, সকলে আছে। সেই ওর সগ্‌গ। আমার সগ্‌গ মরণ। তবে মরণের আগে একটা কথা জানতে ইচ্ছে যায়। নয়া সড়কের বস্তির কি হবে?
সেই কথা। নয়াসড়কের বস্তি! মরবার আগেও ফুলকি জানতে চায়। আবার বলল সে, ফোরটুয়েন্টি, যতটা পারো, ক'রো। তুমি ভরসা। ভরসা। গোবিন্দ ভরসা। বিদায় নিল সে। কোথায় যাবে সে। বস্তিতে? না, তার চেয়ে উকিলের বাড়ি-ই ভাল। যদি আরো কিছু বাকী থাকে।
গোবিন্দ যাওয়ার সময় কালো বলল, ফাঁক পেলে আবার এস।
ফুলকি কয়েকবার ককিয়ে ডাকল, কালো।
বল।
তুমি আমাকে এট্টুস সুখে মরতে দেবে না?
আটকাইনি তো।
আটকাওনি তো কি। তোমার সেবায় যদি বেঁচে যাই।
যদি বেঁচে যায়! মুখটা হাঁ হয়ে গেল কালোর। জানোয়ারের মত। আর চোখ দুটো থেকে খোঁচা খোঁচা গালে জল গড়িয়ে এল।
ফুলকি বুকের ঢাকনা খুলে ফেলল। এখনো নিভাঁজ। মুখের মত শুকিয়ে পুড়ে যায়নি চামড়া। এখনো সুন্দর পুষ্ট। সুউচ্চ বুকের তলায় গাঢ় অন্ধকার। নীচে অস্পষ্ট পেট। তার নীচে ক্ষীণকটিদেশ। সেইখানে রোগের চিহ্ন ইতস্তত ছড়ানো, স্পষ্ট। কালোকে বলল, এস। মরতে চাও, আজকের রাত থেকে, কাল চলে যেও। তোমার আশা পূরণ হোক।
কালো তাড়াতাড়ি ঢাকা দিয়ে, বুকে মুখ গুঁজে বলল, না না, এ মরণ আমি চাইনি ফুলকি। আমি তোমাকে চেয়েছিলুম। তোমাকে।
আমাকে? এই তো আমি।

না। এ তো তুমি অনেককে দিয়েছ। যা তুমি কাউকে দাওনি, তাই আমি চাই!

সে কি বস্তু কালো?

তোমার মহব্বৎ।

ছু'চোখ বড় বড় ক'রে বলল, মহব্বৎ কি কালো। আমাকে বল, বল। মহব্বৎ, মহব্বৎ। সে আবার কি, আমিও যে জানিনে।

তবে? মহব্বৎ। সে কি জিনিস, কি জিনিস।···চাপা গলায় খাঁ খাঁ করে বোবার মত গোঙানি উঠল ফুলকির গলায়। গোঙানিটা কালোরও বুকের মধ্যে ধুঁয়ে ধুঁয়ে উঠতে লাগল।

ছুদিন পর মারা গেল ফুলকি। মরবার আগে সে বলছিল, কালো, মরলে যখন নিয়ে যাবে পোড়াতে, আমাকে সাজিয়ে নিয়ে যেও। কেউ যেন আমাকে ঘেন্না না করে, কুচ্ছিৎ না দেখে।

তাই করেছে কালো। স্নো পাউডার আলতা কাজলে সাজিয়েছে তাকে কালো। তারপর নিয়ে গেছে। প্রথমে কেউ আসেনি। গোবিন্দ আসতে অনেকেই এসেছিল।

পুড়িয়ে ফেরবার পথে কালো বলল গোবিন্দকে, ফোরটুয়েন্টি, আমার শেষবার শেষ হয়ে গেল। বলে গোবিন্দর সঙ্গে এসে উঠল নয়া-সড়কের বস্তিতে।

হোলি উন্মত্ত বস্তি। ঢোল করতালের শব্দে আজ কান পাতা দায়। ঢোকে ঢোকে তাড়ি আর যোগেড়ী নাচে পাগল হয়ে গেছে সবাই। একটা ছোকরা নাচছে মেয়ে সেজে। উৎকট দেহভঙ্গি, কামাতুর কটাক্ষ, ঢলে ঢলে, গায়ে পড়া, তার সঙ্গে যৌবনের রংদার গান, খেম্‌সা। হাওয়া মাতাল, মন মাতাল, মাতাল হয়েছে আকাশ।

রংয়ে কাদায় মাখামাখি চলেছে, বাসন্তী রংয়ে ছোপান পোশাকে ছোপ লেগেছে টকটকে লাল রংয়ের। ডুগডুগি বাজাচ্ছে মাদারি খেল্‌ওয়ালা, রঙ্গ করার জন্য উঠোনে ছেড়ে দিয়েছে তার সাপ ছুটো।

ঝি-বহুড়িরা ঘোমটার ফাঁকে চোখের ইসারায় পুরুষদের আরও উস্‌কে দিচ্ছে।

সদী বুড়ি প্রায় ন্যাংটো, বাড়িওয়ালাও সব ভুলে গড়াগড়ি খাচ্ছে কাদায়।

ফাগে রংয়ে ফাগুয়া উত্তাল।

ছুলারী বাইরে আসেনি। সে তার বাসন্তী রংয়ে ছাপানো শাড়িটি পরে, পারে লাল মাটির পাত্রে রক্ত আবীর নিয়ে হাত দিয়ে ঘাটছে। সামনেই ঠোঙায় রয়েছে নিজের হাতে বানানো টিক্‌লি, দোকানের জিলিপী মণ্ডা, খাজা। আর সলজ্জ মুখে টিপে টিপে হাসছে।

আজকের দিনটির মতই মুখ তার মেঘমুক্ত। সব সংশয় পেরিয়ে আজ সে প্রস্তুত হয়েছে দোস্ত ফোরটুয়েন্টির অভ্যর্থনার জন্য। তার গোস্তাকি হয়েছে, তার পাপ হয়েছে। জীবনদাতাকে সে অপমান করেছে, আঘাত দিয়েছে।

অন্যান্য বছর সে এমনি অপেক্ষা করে থাকত, কখন গণেশ আসবে! গণেশ যখন আসত কিছুটা মত্তাবস্থায়, তখন তারা ছুজনে খেলত ফাগুয়া। আজ সে ফাগুয়া খেলবে দোস্তের সঙ্গে. যার কাছে নেই তার কোন মানার মানামানি।

দিন গেল, সন্ধ্যা গেল, প্রাণ রাঙিয়ে এল পূর্ণিমার রাত্রি। নাচে-গানে দ্বিগুণ উন্মত্ত হল বস্তি। যেন সব আশা শেষ হয়েছে। সব শেষে এক প্রলয় মাতনে ভয়ংকরকে ঠেকিয়ে রাখার এক ব্যর্থ উন্মত্ত চেষ্টা চলেছে।

কিন্তু গোবিন্দের দেখা নেই। সে শেষ মাতনে মাততে পারেনি। তার আশা আছে। সে এখনো ঘুরছে। ওরা অনেক সময় অপরের উপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে নিজেরা ব্যর্থ জীবনের অভ্যাসে থাকে মত্ত হয়ে। নিরাশার গ্লানির এইতো রূপ। সে ছাঁটাই বল, আর উচ্ছেদ বল, যখন তার আশা যায়, ভয় আসে, তখন সে এমনি করে। ওদের এতখানি নির্ভরতার জন্য গোবিন্দের বড় যন্ত্রণা আছে। কিন্তু চুপ করে বসে থাকতে পারেনি। সে আসতে পারেনি, মাততে পারেনি।

মধ্য রাতে ঘুম এসে হরণ করে নিয়ে গেল সব মত্ততা। বাস্তু নিঝুম হয়ে এল। তুলারী তখনো বসে আছে দরজা খুলে, কান পেতে আছে বাইরের দিকে। তারপর এক সময় ঢলে পড়ল ঘুমে।
এবড়ো থেবড়ো উঠোনটা রংয়ে আবীরে বিচিত্র হয়ে হাঁ করে যেন তাকিয়ে রইল চাঁদের দিকে।
ভোরবেলা কারখানার বাঁশীর শব্দ কানে যেতে ধড়ফড়িয়ে উঠে তুলারী একমুহূর্তে হতভম্ব চোখে তাকিয়ে দেখল তার তোলির আয়োজন। তারপর পা দিয়ে সব কিছু ছুঁড়ে ফেলে, দরজায় শেকল তুলে দিয়ে চলে গেল কারখানার দিকে।
গোবিন্দ তখন ফিরে এসেছে কলকাতা থেকে। গতকাল সে উকিলের কাছ থেকে সমস্ত নথীপত্র নিয়ে ব্যারিস্টারের কুঠিতে গিয়েছিল, আর ফিরতে পারেনি। আর তিন দিন মাত্র মামলার রায় বেরুতে বাকি। তার সময় নেই কোনদিকে নজর দেওয়ার।

আকাশে লেগেছে বৈশাখী রং, ঝলসানো তামাটে আভা।
মামলার ফলের একদিন আগে, ভোরবেলা সবাই উঠে বিকৃত মুখে নাকে কাপড় চাপা দিল। অসহ্য দুর্গন্ধে ভরে উঠেছে চারদিক।
সবাই বাইরে এসে দেখল, বস্তির চারপাশে যেন সারা শহরের ময়লা ঢেলে দেওয়া হয়েছে। কী ব্যাপার? কে ফেলল এত ময়লা?
একটু পরেই এল মিউনিসিপ্যালিটির হেল্‌থ্‌ অফিসার। সঙ্গে স্যানিটারি ইন্‌স্পেক্টর আর উল্লসিত বিরিজমোহন।
বিরিজমোহনই প্রথম বলে উঠল, একেবারে জানোয়ারের ডেরা বাবু সাব। তারপর হেসে বলল বাড়িওয়ালাকে, এই যে বাবুসাহেব, জয় গোপালজী। হেল্‌ অপ্‌সর সাব আপনার সঙ্গে থোড়া মোলাকাত করতে এসেছেন।
বাড়িওয়ালা খানিকটা হতভম্ব হয়ে গেছে ব্যাপার দেখে। কেবল অসহ্য রাগে ও ঘৃণায় গোবিন্দ বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেছে। কোটরাগত

চোখ দুটো তার জ্বলে উঠছে ধবক্ ধবক্ করে। সে বুঝতে পারল, একটা সর্বনাশের ষড়যন্ত্র হয়েছে। হয়তো সেই ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে গেছে সবাই। আর মাত্র কয়েকদিন বাকী মামলার রায় বেরুবার। হয়তো মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান স্বয়ং যাবে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হেল্‌থ্ অফিসারের রিপোর্ট নিয়ে।

হ্যাট্‌কোট্ পরা হেল্‌থ্ অফিসার ঘৃণায় মুখ কুঁচকে, নাকে রুমাল চেপে, চোখে গগল্‌স্ পরে চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। পেছনে স্যানিটারি ইন্‌স্পেক্টর।

গোবিন্দ তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠল, হুজুর, চোখের ঠুলিটা খুলে ফেলে দিন, নইলে রং বোঝা যাবে না।

অফিসার সত্যি গগল্‌স্‌টা খুলে ফেলে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল গোবিন্দের দিকে—কি বলছ?

গোবিন্দের মুখটাই আগুনের মত জ্বলে উঠল। কাছে এসে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, বলছি, হুজুরের তো সবই জানা আছে। আর দেখে কি হবে?

হোয়াট? হেল্‌থ্ অফিসারের মুখটা গোল আর লাল হয়ে উঠল।

গোবিন্দ আবার বলল, ময়লাটা মেথর দিয়ে না ফেলিয়ে দু-দিন আগে এলেন না কেন হুজুর?

হেল্‌থ্ অফিসার যেন গোবিন্দের ভাষাটা বুঝতেই পারেনি, এমন ভাবে ফিরে তাকালেন স্যানিটারি ইন্‌স্পেক্টরের দিকে। বললেন, কি বলছে লোকটা?

ইন্‌স্পেক্টর ভীত মানুষ। বলল, বুঝতে পারি না স্যার।

হেল্‌থ্ অফিসার গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বাড়িওয়ালা?

আমি ছুতোর, কিন্তু রাঁধিয়ে। বলে হাসতে গিয়ে হিংস্রভাবে দাঁত বের করে হিসিয়ে উঠল, কিন্তু হুজুর, জমিদারের পয়সা খাওয়া বেজন্মা নই। চোরের মত মিছে রিপোর্ট লেখা আমার পেশা নয়।

মানে? হেল্‌থ্ অফিসার হয়তো রাগেই কাঁপতে থাকে থর্ থর্ করে।

বিরিজমোহন ধমকে উঠল গোবিন্দকে, এও কাম্‌বাক্ত !
চোপ শালা ! গোবিন্দের বাঁ হাতের এক থাপ্পড়ে বিরিজমোহন একেবারে ময়লার মধ্যে গড়িয়ে পড়ল।
অমনি সবাই হেসে উঠে ধেয়ে এল এদিকে।
স্যানিটারি ইন্‌স্পেক্টর সরু গলায় ককিয়ে উঠল, স্যার চলে আসুন, দে আর গুণ্ডাজ্‌।
তবে গুণ্ডার হাতেই আজ জান রেখে যেতে হবে, তাদের, যে শুয়ারের বাচ্চারা এ ময়লা ফেলিয়েছে। বলে গোবিন্দ হেল্‌থ্‌ অফিসারের দিকে এগুতেই কে তাকে শক্ত হাতে ধরে ফেলল। সে তাকিয়ে দেখল, বাড়িওয়ালা।
হেল্‌থ্‌ অফিসার ততক্ষণ স্যানিটারি ইন্‌স্পেক্টরের পিছে পিছে সরে পড়তে আরম্ভ করেছে। আর বিড়বিড় করছে, ইয়েস্‌, গুণ্ডাজ্‌! মার্ডারার্স ! এদিকে বিরিজমোহনকে নিয়ে হল্লা চলেছে। অনেক কষ্টে উঠে বিরিজমোহন খিস্তি করতে করতে একটা উল্লুকের মত চলতে আরম্ভ করল। তার সারা গায়ে ময়লা মাখা। এমনকি মুখে হাতেও। কেবল গোবিন্দ জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল পথের দিকে। বাড়িওয়ালা বলল, আমাকে বুঝিয়ে বল্‌ ফোরটুয়েন্টি, এসবের মানে কি ?
সবাই ঘিরে এল গোবিন্দকে। কি হয়েছে, কেন এল এরা। কে ফেলল বস্তিটার চারপাশে এত ময়লা।
গোবিন্দ বলল, বুঝতে পারলে না ? মামলার শেষ রক্ষে করতে চাইছে ওরা। মিসিপাল্‌টির বাবুরা আর্জি করবে ধর্মাবতারের কাছে, এ ময়লা বস্তিটা যাতে তুলে দেওয়া হয়।
সবাই অবাক হয়ে এ বিচিত্র গল্প শুনল। কে বলল, আগে জানলে আমি সারারাত পাহারা দিতাম। দেখতাম কেমন করে শালা ময়লা ফেলে।
আগে জানলে ! গোবিন্দ মনে মনে বলে, আগে জান্‌লে অনেক কিছুই করা যেত। জমিদার এ মামলা-ই করতে পারত না। কিন্তু সে আর দেরী করতে পারে না। ছুটে চলে গেল উকিলের কাছে।

উকিলের কাছ থেকে ব্যারিস্টারের বাড়ি। এখন মনে পড়েছে, ব্যারিস্টার বাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন, বাড়িটার আশেপাশে সব পরিষ্কার আছে কিনা।

গোবিন্দ এল ব্যারিস্টার বাড়ি। অন্ধ ব্যারিস্টারবাবু। গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বসে বসে লাল ফুটকি দেওয়া কাগজ হাতড়াচ্ছেন। সদাশিব মানুষ। গরীবের বন্ধু। কথার ফাঁকে ফাঁকে টেবিলে টোকা দেন। আবার লাল ফুটকি কাগজ হাতড়ান। গোবিন্দ জানে না, ওটায় কি পাওয়া যায়। পাশে বসে থাকা কর্মচারীকে বলেন, সে লিখে নেয় সব কথা। আবার থেকে থেকে হঠাৎ গুন্‌গুন্ করে ওঠেন।

গোবিন্দ এসে নমস্কার জানাতেই বললেন, কে, গোবিন্দ? কি খবর?

গোবিন্দ সব কথা বলল। শুনে তিনি নীরব রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন, গোবিন্দ, শয়তানের সঙ্গে শয়তানীতে পাল্লা দেওয়া যায় না। ওদের অন্যভাবে কাবু করতে হয়। তবু মানুষ শয়তানের কাছে হার মানে মাঝে মাঝে। তোমাদের হয়তো হার মানতে হবে।

গোবিন্দ নিস্তব্ধ। তার বুকের মধ্যে এক অদৃশ্য শাণিত নখ খোঁচাতে লাগল।

তিনি আবার বললেন হঠাৎ. আচ্ছা গোবিন্দ, বস্তি যায় যাক, ওখানে তো সত্যি মানুষ থাকতে পারে না। বলে অন্ধকার চোখ দুটো তুলে তাকালেন যেন ঠিক গোবিন্দের দিকেই। গোবিন্দ বলল, কে থাকতে চায়। কিন্তু কোথায় থাকবে বাবু? এখান থেকে গেলে বিরিজমোহনের বস্তিতে যাবে। সে যে আরো নোংরা।

কেন, গরীবের মত ভাল বাড়িতে?

সে কোথায় বাবু? সবই যে বস্তি। ভাল বাড়ির পয়সা কোথায়?

কেন, কোম্পানীর কোয়ার্টারে?

লাইনে? সে ও যে নরক বাবু। আর কটা লোক সেখানে থাকতে পারে? শতকরা পাঁচজন। আর এ বাড়ি যদি উঠিয়ে দেওয়া হয়, মানুষগুলান যাবে কোথায়?

তাঁর অন্ধ চোখের পাতা কেঁপে উঠল। বললেন, সব জায়গায় আঁট

ঘাঁট বাঁধা, না ?

আপনি তো সবই জানেন।

নিশ্বাস ফেলে বললেন, সব কি জানি গোবিন্দ। তোমার কাছ থেকে জানলুম। তোমার কথাগুলিই শেষদিন বলব হাকিমকে। এ ছাড়া তো কোন যুক্তি নেই।

গোবিন্দের কথা হাকিমকে! ছিঃ তা' কি হয়। গোবিন্দের বুকটা ভেঙ্গে দুমড়ে যেতে লাগল নিঃশব্দে।

দুপুর বেলা। নির্বাক নিস্তব্ধ বস্তি। যেন নেশা করে পড়ে আছে। হাওয়া নেই, বদ্ধ গুমোট। বসন্ত গিয়ে গ্রীষ্ম আসছে। আসছে বৈশাখ। সবাই উন্মুখ হয়ে বসে আছে খবরের প্রত্যাশায়।

দুপুরের পর কোর্ট থেকে সবাই ফিরে এল খবর নিয়ে। জজ বলেছে —আইনতঃ যদিও জমিটা প্রজারই ঠিকা স্বত্ব, তবু মিউনিসিপ্যালিটির রিপোর্ট অনুযায়ী এরকম একটা নোংরা আস্তানা বিশেষকে রাখা স্বাস্থ্য ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। যত শীঘ্র এর অপসারণ হয়, ততই মঙ্গল। মাত্র এক মাসের নোটিশ দিয়ে জানিয়েছেন, যেন এ বস্তিটি অপসারিত করা হয়। অন্যথায় উক্ত সময়ের পর সাত দিনের মধ্যে দখলকারী প্রজাকে উচ্ছেদ করা যাবে।

গোবিন্দের সমস্ত প্রচেষ্টা ভেসে গেছে। তার দু-হাত ধরে আক্ষেপ জানিয়ে গেছেন ব্যারিস্টার! বলেছেন, গোবিন্দ ওদের আইন যে বে-আইনী হতে পারে এটা ওরা জানতে দিতে চায় না। এ আইন একদিন বদলাবে। উকিল আপসোস করেছে।

উঠোনে সবাই হাঁ করে বসে আছে। গোল হয়ে গেছে সকলের চোখগুলো বিস্ময়ে, দুশ্চিন্তায়। একটা খাটিয়ার উপর খালি গায়ে শূন্য দৃষ্টিতে বসে আছে বাড়িওয়ালা। তার চোখের সামনে যেন সব অন্ধকার হয়ে গেছে। তার চিরজীবনের ব্যর্থতা যেন তার সামনে এসে খল্ খল্ করে হাসছে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে।

গলির মুখটায় এসে দাঁড়াল গোবিন্দ। হাড্ডিসার ক্ষীণজীবী চেহারা, উস্‌কো খুস্‌কো চুল, চোয়াল ছুটো ছুঁচলো হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। গায়ের জামাটা এখানে সেখানে ছেঁড়া। সর্বাঙ্গ ধূলিমলিন।

সবাই তার দিকে ফিরে তাকাল, কিন্তু কথা বলল না।

বাড়িওয়ালা মুখ ফিরিয়ে রইল তার দিক থেকে।

এমন সময় বাড়ির বাইরে গণ্ডগোল শুনে সবাই বেরিয়ে এল।

জমিদার এসেছে, এসেছে শাবল কুড়ুল হাতে এক দঙ্গল মানুষ। তারা একদিনও সবুর করতে পারবে না। আর এসেছে বিরিজমোহন।

নাজির ঘোষণা করল গম্ভীর গলায় ঃ মামলার রায় হতেই এ জমির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, জমি খালি করে দাও।

জমি খালি করে দাও? এ বস্তিটা সুদ্ধ?……হঠাৎ একটা চিৎকার আর হট্টগোল লেগে গেল।

হট্টগোল আর কান্না। ঘর খালি কর……খালি কর।…

আকাশের গুমোট কেটে হাওয়া দিতে শুরু করেছে, অকাল বৈশাখী মেঘ হু হু করে মাথা উঁচিয়ে ধেয়ে আসছে উত্তর পূব কোণ থেকে। গুম্‌ গুম্‌ শব্দে ভেসে আসছে রুদ্রের পদধ্বনি।

সারা বস্তিময় কোলাহল, কান্না, ছুটোছুটি জিনিসপত্রের দুম্‌দাম আওয়াজ।……কোথা যাব…কোথা যাব!……

হঠাৎ দেখা গেল শাবল কুড়ুল হাতে দলটা বস্তির একদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাঙতে আরম্ভ করেছে। মাটি আর ছিঁটে বেড়া, বাঁশ আর কঞ্চি, পুরনো খোলা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, ধুলো উড়ছে।

গোবিন্দ নিথর। যেন আচমকা আক্রমণে বুদ্ধিবিভ্রম হয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে বাড়িওয়ালা পড়্‌ পড়্‌ করে টেনে ছিঁড়ছে বুকের চুল।

ছুটির ভোঁ বেজে উঠলো গোঁ গোঁ করে। কালবৈশাখীর আভা উঠে আসছে মাঝ আকাশে। ঝল্‌সে উঠছে বিদ্যুৎ।

মেয়ে আর শিশুর গলার আর্তনাদ ভেসে এল।

আচমকা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে যেন গোবিন্দ তীব্র গলায় চিৎকার করে

উঠল, না—না মিথ্যে কথা। এখনো সময় আছে। ভাঙতে পারবে না।

বলে সে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শাবল কুড়ুলওয়ালাদের উপর।

রোখ···থাম।···

জমিদার হুকুম করল, চালাও!

কিন্তু থেমে গেল ভাঙা। লোকগুলো অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল গোবিন্দের দিকে। গোবিন্দ বলল, এখনো সময় হয়নি। এখনো উপর কোর্টে মামলা যাবে। কোন পরচা না দেখিয়ে তোমরা ভাঙ্গতে পারবে না। এতগুলি লোক কোথায় যাবে।

জাহান্নামে। বলে বিরিজমোহন চেঁচিয়ে উঠল। হটাও বদমাইস্‌টাকে।

একটা ঠেলাঠেলি লাগল। একটা চাপা গুলতানি। তারপর হঠাৎ খানিকটা খোলার চালা ভেঙ্গে পড়ল আর চীৎকার উঠল।

বাড়িওয়ালা ছুটে এল, ছুটে এল বস্তির সবাই। একমুহূর্তে যেন নাটকের মঞ্চে বিরতি নেমে এসেছে।

কে একজন চিৎকার করে উঠল, খুন!—

হা হা রবে মেঘ ছুটে আসছে, কালবৈশাখীর অট্টহাসি ভেসে আসছে আকাশ থেকে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

বাড়িওয়ালা চিৎকার করে ডাকল, ফোরটুয়েন্টি!

নির্বাক গোবিন্দ, সারা গা মাথা রক্তারক্তি। আধবোজা চোখে যেন সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। রোগা শরীর, উস্‌কোখুস্‌কো চুল।

অনেকগুলো গলা সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো, খুন করেছে।—

জমিদারের দলটা পালাচ্ছে সকলের এ বিহ্বলতার ফাঁকে। শাবল কুড়ুলের দলটাও চেঁচাচ্ছে, খুন! কে খুন করল। কে? কে?

বিরিজমোহন চীৎকার ক'রে বলল, ভূত। ভূতে মেরেছে ওকে।

তারা সব মেঘাচ্ছন্ন গাঢ় অন্ধকারে পালাল।

বাড়িওয়ালা গোবিন্দকে তুলে নিয়ে এল বস্তির উঠোনে।

বস্তির পূর্ব দিকটা প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। সেই মুক্তপথে হু হু করে

হাওয়া আসছে। গোবিন্দ তখনো মরেনি। বোধ করি শেষবারের জন্য সে ওদিকে ফিরে তাকাল। ওই উত্তর দক্ষিণে বিলম্বিত নিউ কর্ড রোড, পূর্বে ঝোপে ঝাড়ে ছাওয়া বাঁকা রাস্তা চলে গেছে রেল লাইন পেরিয়ে, বহু দূরে—বারাসাত···বসিরহাট···ইটিণ্ডেঘাট··· ইচ্ছামতী! ছুতোর বউ, ছেলে···

বায়ুকোণ থেকে গোঁ গোঁ করে হাওয়া ছুটে এল। গোবিন্দের মাথার চুলগুলি এলোমেলো হয়ে গেল। পূর্ব দিকটা বিধ্বস্ত হয়ে যেন বস্তিটা মাঠের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে, যেন আকাশ এসে ছুঁয়েছে উঠোনটা। দুলারী এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। গোবিন্দের দোস্তানি। কিন্তু গোবিন্দের চোখের দৃষ্টি তখন স্থির হয়ে গেছে। সে আধখোলা চোখের দৃষ্টি যেন শান্ত, কিন্তু ক্ষুব্ধ।

কে একজন বলে উঠল, হ্যাখ, শাবল নয়, পেটের কাছে ছুরি মারার দাগ রয়েছে। লুকিয়ে মেরেছে, নইলে···

বাড়িওয়ালা বিড়বিড় করছে, জমিদার···দালাল!

একটা শিশু গলা ফিসফিসিয়ে উঠল, মেরে ফেলেছে ফোর্টুন্টি চাচাকে! খোলা পূব দিক থেকে ঝড়ের ঝাপটা বয়ে যেতে লাগল। সাপের চেরা জিভের মত যেন হিসিয়ে উঠছে বিদ্যুৎ। গুম্ গুম্ শব্দে ধরিত্রী কাঁপছে।

সমস্ত এলাকা খালি করে লোক আসছে, ভরে উঠছে উঠোনটা। সবাই দেখতে আসছে ফোরটুয়েন্টিকে।

কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, আমি জানি ওকে কে মেরেছে!—কিন্তু মাঝ পথেই অসহ্য তিক্ত গলাটা যেন চেপে বন্ধ হয়ে গেল।

বাড়িওয়ালা ছুটে ঘরে চলে গেল। অসহ্য একটা অপরাধ বোধের যন্ত্রণা তাকে কামড়ে ধরেছে, তার জীবনের শেষ সম্বল তিন শো টাকার থলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে।—কার জন্য এসব! আমি বেইমান! আমি আসল ফকির বনেছি—ফকির।

দুলারী সকলের অলক্ষ্যে নিজের ঘরে গিয়ে মাটিতে মুখ দিয়ে হু হু করে কেঁদে উঠল, আমার কলিজার দুটো পাশ; একটা জেলবন্দী আর

একটা আমি আপনা হাতে টিপে দিয়েছি, শেষ করেছি।···আমার ভাঙা ঘর···।

সেই রুগ্ন ছেলেটির মধ্যবয়সী মা গোবিন্দের পাশে বসে তার কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিল, মুখের রক্ত মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, আমি তোকে যম বলেছি, আমার সোনার বাছা। তোর যম যেন কোনদিন রেহাই না পায়।

তারপর সব নিস্তব্ধ। আস্তে আস্তে একটা অদ্ভুত গুল্‌তানি উঠতে লাগল ভিড়েব মধ্যে। উঠোনের বাইরে মাঠে ছড়িয়ে পড়ছে ভিড়। আকাশের কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা গুল্‌তানি হু হু করে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে দিগন্তে।

সমাপ্ত